বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার

বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ॥
॥ ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২ ॥

কারণোত্তর

"বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার" প্রকাশিত হ'ল। এই পুস্তকের মধ্যে আমি শিশিরকুমারের জীবনকাহিনী বর্ণনা করবার বা তাঁর দ্বারা অভিনীত প্রত্যেক ভূমিকার পরিচয় দেবার কোন চেষ্টাই করিনি ; আশা করি সে কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করবেন যোগ্যতর ব্যক্তি। এ সত্য এখন সর্ব্বসম্মত যে, সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে নবযুগের প্রবর্ত্তক হচ্ছেন শিশিরকুমারই। এক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিশেষত্বের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে, সে সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা আছে ব'লে মনে হয় না। প্রতিভা রচনা করে নিত্য-নূতনের ইন্দ্রজাল। শিশিরকুমারের প্রতিভার কাছ থেকে আমরা কি কি নূতন দান লাভ করেছি, তাও ভেবে দেখবার কথা। এই পুস্তকে প্রধানতঃ সেই সব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে।

এই আলোচনা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শীরূপে আমার নিজের কথা এবং দ্বিতীয় ভাগে বা পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হয়েছে রসজ্ঞ সুধীজনদের মতামত। এই দুইভাগ মন দিয়ে পড়লেই যে শিশিরকুমারের প্রকৃত স্বরূপ সকলের কাছে বিশদ হয়ে উঠবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

সর্ব্বশেষে শিশিরকুমারের দ্বারা অভিনীত বিবিধ ভূমিকার একটি প্রায়-সম্পূর্ণ ফর্দ্দ দাখিল করা হ'ল। সেটা তাঁর প্রতিভাবৈচিত্র্য বোঝবার পক্ষে অল্প সাহায্য করবে না।

শিশিরকুমারের নটজীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে, অভিনয় প্রদর্শনের জন্যে সম্প্রদায় নিয়ে তাঁর সুদূর আমেরিকায় গমন। বাংলা নাট্যজগতে এটা ছিল একটা অভাবিত ঘটনা। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যক্ষদর্শীরূপে যথাস্থানে উপস্থিত ছিলুম না ব'লে এই পুস্তকে সেখানকার কথা নিয়ে কোন আলোচনাই করতে পারিনি।

এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, স্নেহাস্পদ শ্রীমান সুজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে। কারণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার সময়ে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ইতি

কলিকাতা, বাগবাজার
২৩০।১, আপার চিৎপুর রোড।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

নাট্যকলার একান্ত সাধক

ও

প্রবীণ আচার্য্য

শ্রীমন্মথমোহন বসু মহাশয়ের

করকমলে

সশ্রদ্ধ উপহার

এক

গিরিশচন্দ্রের জীবনকালে আমাদের নাট্যজগতে তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেতার সংখ্যা যে এখনকার চেয়ে বেশী ছিল, এ সত্য অস্বীকার করতে পারব না। কিন্তু এটাও খুব সত্য কথা যে, গিরিশ যুগের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতারা ছিলেন এখনকার চেয়ে দলে বেশ ভারি। গিরিশ, অর্দ্ধেন্দু ও অমৃত মিত্রের কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি, কারণ তাঁরা ছিলেন একেবারে শীর্ষস্থানীয়। তাঁদের পরেই মনে আসে দানীবাবুর নাম—সেদিন পর্য্যন্ত যিনি লাখটাকা মূল্যের মরা হাতীর মত নবযুগের নাট্যশিল্পীদেরও মাঝখানে নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি ছাড়া এমন আরো কয়েকজন শিল্পীর নাম করা যায়, বেঁচে থাকলে যাঁরা নবযুগেও কেবল যে আপন আপন বৈশিষ্ট্যই বজায় রাখতে পারতেন তা নয়, অনেক স্থলেই প্রমাণিত করতে পারতেন নিজেদের অতুলনীয়তাও।

ধরুন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা। তিনি গিরিশ-যুগের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন না। দানীবাবুকেও বাদ দিলে সে সময়ে তাঁর চেয়ে ভালো নট ছিলেন আরো কয়েক জন। কিন্তু এই অপরেশচন্দ্রই পরিণত বয়সে "আর্টে"র আসরে "চিরকুমার সভা"য় যখন তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নূতন দলের প্রধান প্রধান শিল্পীর সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাঁর দেহ ছিল রোগে পঙ্গু ও আড়ষ্ট; তবু নবীনদের কেহই তাঁর নাট্যনৈপুণ্যকে এতটুকু ম্লান ক'রে দিতে পারেন নি।

অপরেশচন্দ্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন তারক পালিত।

"মেবার-পতন" পালায় তিনি যে ভূমিকাটি গ্রহণ করতেন, তার নাম গোবিন্দ সিংহ। কিছুকাল আগে "রঙমহলে" পূর্ব্বোক্ত পালাটির পুনরভিনয় দেখেছিলুম এবং গোবিন্দ সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট অহীন্দ্র চৌধুরী। তিনি মন্দ অভিনয় করেন নি, কিন্তু তাঁর চেয়ে তারক পালিতের অভিনয় হয়েছিল যথেষ্ট উন্নত।

অন্যান্য নানা দিক দিয়েও প্রকাশ পায় নবযুগের বিশেষ দৈন্য। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত একাধারে সুরশিল্পী, গায়ক, নৃত্যাচার্য্য, নর্ত্তক ও হাস্যাভিনেতা আধুনিক যুগে একজনও নেই। তাঁর নাচ, গান, অভিনয় আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। রাণুবাবুও নৃত্যে ও হাস্যাভিনয়ে আজও অতুলনীয় হয়ে আছেন এবং নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। বর্ত্তমানে বাংলা রঙ্গালয় নৃত্যের ক্ষেত্রে যে অধোগতি অবলম্বন করেছে, তা দেখলে মনে হয় না নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মত নৃত্যশিল্পী এখানে আবার কখনো আত্মপ্রকাশ করবেন। স্বর্গীয়া সুশীলাবালার মত চৌকস শিল্পীকে নিয়েও নবযুগ গর্ব্ব করতে পারে না।

সত্যি কথা বলতে কি, একসঙ্গে যদি উচ্চশ্রেণীর অভিনয়, নাচ ও গানের কথা ধরি, আমাদের এই বহু-বিজ্ঞাপিত নবযুগ কিছুতেই গিরিশ-যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারবে না। নাট্যসাহিত্যের দিক দিয়েও দেখি, যে সব বাঙালী নাট্যকারের রচনা নিয়ে আমরা গর্ব্ব করি, তাঁরা প্রত্যেকেই লেখনীধারণ করেছিলেন গিরিশ-যুগেই। অবশ্য মাইকেল ও দীনবন্ধু ছিলেন গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং প্রধানতঃ তাঁদের নাটকাবলী অবলম্বন ক'রেই গিরিশ ও অর্দ্ধেন্দু প্রভৃতি পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ান। অধিকন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী হয়েও মাইকেল পরে নাট্যকাররূপে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে যোগদানও করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের (১৯১২ খৃষ্টাব্দে) পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁর অভাব ভালো ক'রে বোঝা যায়নি। জল ঢালবার পর কলস খালি হয়ে গেলেও জলের ধারা নিজের জোরেই খানিক দূর এগিয়ে চলে। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা-কুম্ভ থেকে নিক্ষিপ্ত ধারা অবলম্বন ক'রে তাঁর শিষ্যবৃন্দ আরো কিছুদূর অগ্রসর হ'তে পারলেন বটে, কিন্তু ক্রমেই শীর্ণ ও শুষ্ক হয়ে এল ধারা। দেখতে দেখতে এল প্রায় দ্বাদশবর্ষব্যাপী রীতিমত অজন্মার যুগ। শিল্পীরা হারিয়ে ফেললেন সৃষ্টিক্ষমতা—এমন কি দানীবাবু পর্য্যন্ত যা করতে লাগলেন তাকে রোমন্থন ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। যাঁরা তাঁকে গিরিশ-যুগে মিনার্ভা থিয়েটারে এবং পরে মনোমোহন প্রভৃতি থিয়েটারে দেখেছেন, তাঁরাই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। অতীতের উৎসের মুখ বন্ধ, তবু সবাই বর্ত্তমান যুগধর্ম্মকে ভুলে তাকিয়ে আছে অতীতের দিকেই, এমন বুদ্ধিহীনতার ভিতরে কোন ললিতকলাই বেঁচে থাকতে পারে না এবং বাংলা নাট্যকলাও তাই হয়ে পড়ল মরো-মরো। সেই দুর্দ্দিনের কথা আমি অন্যত্র বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছি, এখানে আর পুনরুক্তি করব না। অবশেষে আমাদের নাট্যজগতে অমা রাত্রিশেষে সর্ব্বপ্রথমে নব-প্রভাতের শঙ্খধ্বনি করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। অতএব আমরা তাঁর কথা নিয়েই আলোচনা করব এবং দেখব কি কি নূতনত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছে তাঁর অমৃতায়মান নাট্যপ্রতিভা।

দুই

মূর্খের সম্পত্তি নয় নাট্যকলা। নাট্যশালা হয়েছে বিবিধ কলার মিলনক্ষেত্র—সাহিত্য, অভিনয়, নৃত্য, সঙ্গীত ও চিত্র। এখানে যিনি নাট্যশিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চাইবেন তাঁর মধ্যে থাকা চাই সাহিত্যবোধ, চিন্তাশক্তি, রসানুভূতি, সৃজনক্ষমতা, সংস্কৃতি ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতি আরো অনেক কিছুই। যাঁরা বাংলা রঙ্গালয়ের পত্তন করেছিলেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ গুণী—যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, মাইকেল ও গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও অমৃতলাল বসুও কৃতবিদ্য ছিলেন।

অর্দ্ধেন্দু ও গিরিশচন্দ্র পরলোকে গমন করলেন। অমৃতলাল তার পরেও কিছুকাল ইহলোকে বিদ্যমান ছিলেন বটে, কিন্তু জরাগ্রস্ত ও প্রায় অক্ষম অবস্থায়। নাট্যজগতের বাইরে বৈঠকে আলবোলার নল হাতে ক'রে ব'সে সমাগত বন্ধু ও স্নেহপাত্রদের সঙ্গে রসালাপ করতে করতেই তাঁর অধিকাংশ সময় কেটে যেত। মনোমোহন-যুগে যাঁরা ছিলেন নাট্যজগতের কেষ্ট-বিষ্টু, তাঁদের মধ্যে অপরেশচন্দ্র ও আরো দুই-একজন ছাড়া বাকি সকলকেই অল্পবিস্তর প্রাকৃতজন বললেও অন্যায় বলা হবে না। তখনকার অভিনেতৃগণের যিনি নেতা, সেই দানীবাবুর যে শিক্ষা বা সংস্কৃতি কিছুই ছিল না, একথা সকলেই জানেন। ঈশ্বরদত্ত শক্তির অধিকারী হয়ে এবং পিতৃদত্ত শিক্ষার গুণে তিনি অভিনয়ের আসর রাখতে পারতেন বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। প্রয়োগকর্ত্তা কিংবা নাট্যাচার্য্যরূপে একদল নূতন শিল্পী সংগঠন ও অভিনয়ের কোন নূতন ভঙ্গি বা 'ষ্টাইল' প্রবর্ত্তন ক'রে নবযুগ আনবার কোন ক্ষমতাই

তাঁর ছিল না। পিতৃদেবের নাট্যানুরাগের ফলে বাল্যকাল থেকে আমিও নাট্যকলার অনুরাগী ব'লেই সেই অজন্মার যুগেও বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারি নি। কিন্তু অভিনয়ের ক্রমিক অধঃপতন দেখে বাংলা রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে মনের ভিতরে যা পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠত তা নিরাশা ও অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সময়েই হঠাৎ একদিন খবর পেলুম, ম্যাডান কোম্পানীর বাংলা রঙ্গালয়ে পেশাদার অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করবেন স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তার আগেই লোকের মুখে সৌখীন অভিনয়ে শিশিরকুমারের দক্ষতার কথা শুনতুম। কিন্তু এ-রকম জনশ্রুতিকে কোনদিনই আমি আমল দিই নি, কারণ আরো অনেক সখের অভিনেতার সুনাম শুনে তাঁদের অভিনয় দেখতে গিয়ে কিছু-মাত্র অভিভূত হইনি। তবু শিশিরকুমার পেশাদার নট হবেন শুনে মন হ'ল বিস্মিত ও সচকিত। কেননা তখনও আমাদের শিক্ষিত সমাজে পেশাদার নটদের মনে করা হ'ত অনেকটা হরিজনেরই মত। তাঁদের সঙ্গেই যোগদান করবেন শিশিরকুমারের মত বিদ্বজ্জনদের মধ্যে সমাদৃত ব্যক্তি! এই অদ্ভুত সংবাদ তখনকার শিক্ষিত সমাজে যে কি উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল তা এখনো আমার বেশ মনে আছে।

যেখানে প্রাচীন হ'লেও দানীবাবু বিরাজ করছেন একছত্র রাজার মত, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উদ্যত হয়েছেন যে সৌখীন অভিনেতা, তাঁর শক্তির সীমা কতটুকু? মনে জাগল এই প্রশ্ন। গ্রাজুয়েট হ'লেই ভালো অভিনেতা হওয়া যায়, এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস আমার কোনদিনই ছিল না। আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে গ্রাজুয়েটের আবির্ভাবও নূতন ব্যাপার নয়। ক্লাসিক থিয়েটারের আমলে

বি-এ ডিগ্রিধারী মনোমোহন গোস্বামীকে নিয়েও আগে খুব ঢাক-ঢোল পিটানো হয়েছিল। প্রাচীরপত্রে বড় বড় হরপে নাম, মঞ্চের উপরে বড় বড় ভূমিকা—কিন্তু হায়, শেষটা দেখা গেল যে, গোঁসাইজী হচ্ছেন পিতলের কাটারির মত—যা উপরেই ঝকমকে, কিন্তু কাজে বড় আসে না। ম্যাডান কোম্পানীও তেমনি আর একখানি পিতলের কাটারি আমদানি করছেন নাকি?

ঠিক এই সময়েই সৌখীন নটরূপে শিশিরকুমারের শেষ-অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়ে যথাসময়েই প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে হাজিরা দিতে বিলম্ব করলুম না। পালা ছিল "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস", শিশিরকুমার গ্রহণ করবেন ভীম ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকা। যবনিকা উঠল। অভিনয় যা দেখলুম, আমার কল্পনাতীত। সে অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশ করেছিলুম তখনকার বিখ্যাত দৈনিকপত্র "হিন্দুস্থানে" (সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় ললিতমোহন গুপ্ত)।

বাংলা রঙ্গালয়ে তখনও 'প্রডিউসার' বা প্রয়োগকর্ত্তা ব'লে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না। এবং প্রয়োগনৈপুণ্য কাকে বলে সে সম্বন্ধে কারুর কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল ব'লেও আমার বিশ্বাস নেই। এ বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা করব পরে, এখানে খালি এইটুকুই ব'লে রাখি যে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর বাইরে বাংলা নাট্যজগতে সর্ব্বপ্রথমে নবযুগোপযোগী প্রয়োগকৌশলের পরিচয় পেয়েছিলুম সেই "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাট্যাভিনয়েই। শিশিরকুমারের অভিনয় তখনও যে অতুলনীয় ও প্রথম শ্রেণীর উপযোগী হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেইসঙ্গে বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলুম তাঁর প্রয়োগপটুতা দেখে (আগেই শুনেছিলুম এই অনুষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন তিনিই)। অমন যে সেকেলে পালা, প্রয়োগপটুতার গুণে তাও হয়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ

নূতন ও বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নাটকের মত। সাজপোষাক ও অভিনয়ের নূতন ভঙ্গিও দিলে নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিত। অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে উঠলুম। মনে বারংবার প্রশ্ন জাগতে লাগল, অধঃপতিত বাংলা নাট্যজগতে এতদিন যাঁর পদধ্বনি শোনবার জন্যে নিরাশার মধ্যেও আশার স্বপ্ন দেখেছিলুম ইনিই কি তিনি? এঁর শুভাগমনে আবার কি নূতন ক'রে জ্ব'লে উঠবে আমাদের রঙ্গালয়ের নিবু-নিবু পাদপ্রদীপ ?

তিন

'মনোমোহন'-যুগের বাংলা রঙ্গালয়ের অধঃপতনের সুযোগ গ্রহণ করলেন পার্সী ম্যাডান কোম্পানী। এক সময়ে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ভারতের অরাজকতা দেখে উৎসাহিত হয়ে বিদেশী বণিকরা সহজেই লক্ষ্মীলাভ করবার লোভে এদেশে ছুটে আসত। আমাদের নায়কহীন নাট্যজগতের অবস্থা দেখে ম্যাডান কোম্পানীও তেমনি উৎসাহিত হয়ে ভাবলেন, তাঁরাও খালি তুড়ি মেরে সস্তায় কিস্তি মাৎ করতে পারবেন।

ম্যাডানরা একেবারেই ব্যবসাদার। পাটোয়ারি বুদ্ধির বাইরে তাঁদের মাথা খেলে না এবং বাংলা দেশে যে আর্ট ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব আছে, এটুকু আন্দাজ করবার শক্তিও তাঁদের ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা দেখলেন, নাচ-গান ফষ্টিনষ্টি, জমকালো সাজ-পোষাক ও চমকদার দৃশ্যপট পেলেই বাঙালী দর্শকরা ওঠে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে এবং প্রধানতঃ সেই সবেরই সাহায্যে কুনাটক ও কুঅভিনয়ের বিনিময়ে মনোমোহন পাঁড়ে থিয়েটারি বাজার থেকে বেশ দু-পয়সা কামিয়ে নিচ্ছেন। তাঁদের দ্বারা অধিকৃত ধর্ম্মতলার পার্শী রঙ্গালয়টি যখন এই পদ্ধতিতেই প্রচুর অর্থের সন্ধান দেয়, তখন অবাঙালী হয়েও বাংলা থিয়েটার খুলে তাঁরাই বা বাজার দখল করতে পারবেন না কেন? তাঁদের মূলধনের অভাব নেই, অতএব টাকা দিয়ে টাকা টেনে আনতে কোনই বেগ পেতে হবে না।

হলেন তাঁরা কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ। সংগ্রহ করলেন একদল তৃতীয় বা নিম্নতর শ্রেণীর নট-নটী এবং একপাল নর্ত্তকী। উর্দ্ধতর শ্রেণীর নট-নটীর জন্যে তাঁরা যে একেবারেই চেষ্টা করেন নি, তাও বলতে পারি না। হয়তো

দানীবাবুর দিকেও ছিল তাঁদের লুব্ধ দৃষ্টি, কারণ বাংলা নাট্য-জগতে তাঁর চেয়ে প্রতিষ্ঠাভাজন ও জনপ্রিয় নট আর কেউ ছিলেন না। একমাত্র তাঁরই নামের জোরে 'মনোমোহনে'র আসর এত বেশী জমজমাট। কিন্তু দানীবাবু কেবল 'মনোমোহনে'র অধ্যক্ষ নন, অর্দ্ধেক আয়েরও অধিকারী। সুতরাং তাঁরা বুঝতে পারলেন, দানীবাবুর কাছে বিশেষ সুবিধা হবার সম্ভাবনা নেই। তখন তাঁরা অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরীকে জালে ফেলবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা দুজনেই ষ্টার থিয়েটারের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন বটে, তবে 'ষ্টারে'র আর্থিক অবস্থা তখন আশাপ্রদ ছিল না। কিন্তু তবু বিদেশী মালিকের স্ফীতোদর অধিকতর স্ফীত ক'রে স্বদেশী আর্টের সর্ব্বনাশ করবার জন্যে তাঁদের কারুরই আগ্রহ হ'ল না। অর্থের প্রলোভন তাঁরা সংবরণ করলেন এবং এজন্যে আমরা অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরীকে অনায়াসেই সাধুবাদ দিতে পারি।

কিন্তু ম্যাডানরা দমলেন না। ভাবলেন, পার্শীদের মত বাঙালীরাও যা চায়—অর্থাৎ ফষ্টিনষ্টি, সাজ-পোষাক, দৃশ্যপট ও নাচ-গান দিয়েই আমরা কেল্লা ফতে করব। তার উপরে আছেন আমাদের মহানাট্যকার আগা হাসার, ছাতু-ডাল-রুটির মুল্লুকে যাঁর নাম নাকি সেক্সপিয়ারেরও চেয়ে বড়। লিখুন তিনি নব নব পালা, তর্জ্জমা করুক কোন মাহিনা-করা বাঙালী বাবু—টিকিট-ঘর হয়ে উঠবে রূপোর চাক্তিতে ঝনঝনায়মান। কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে বসল অভিনব অভিনয়ের আসর। বহু রংচঙে বিজ্ঞাপনের ঢাক পিটিয়ে নব রঙ্গালয়ের যবনিকা উত্তোলন করা হ'ল। প্রথম দুই একদিন হয়তো কৌতূহলের বশবর্ত্তী দর্শকের অভাব হ'ল না, কিন্তু তারপরই দেখতে দেখতে প্রেক্ষাগৃহ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ল। আগা হাসার কাৎ এবং ম্যাডানদের চোখ ফুটল অকস্মাৎ।

এত শীঘ্র যে বাঙালী গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর ঐতিহ্য ভুলবে, এটা আশা করাই অন্যায়। তখন দেশে উচ্চশ্রেণীর নূতন নাট্যকার ও নবীন নট-নটীর অভাব হয়েছিল, একথা সত্য। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর হাতে গড়া কয়েকজন শক্তিশালী নট-নটী পাদপ্রদীপের সামনে বিদ্যমান—যদিও তাঁদের অধিকাংশই গুরুদত্ত বিদ্যার বাইরে বিশেষ কোন নূতনত্ব সৃষ্টি করবার শক্তি থেকে বঞ্চিত, তবু পুরানো চাল নাকি ভাতে বাড়ে। তখনও গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির নাটকের আদর্শ বাঙালীদের অভিভূত করে এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ ইহলোকেই বর্ত্তমান, এমন যায়গায় পার্সী থিয়েটারের আগা হাসারের বেসাতি লোকে সহ্য করবে, এটা কল্পনাতেও আনা যায় না। ভাঁড়ামি বাঁদর-নাচ, হাসি-মস্করার গান, বাহারি সাজপোষাক, রংচঙে ছবি-আঁকা পট? যারা "প্রফুল্ল", "বলিদান", "শঙ্করাচার্য্য", "সিরাজদ্দৌলা", "প্রতাপাদিত্য", "চন্দ্রগুপ্ত" ও "সাজাহানে"র মর্য্যাদা আজও ভোলেনি, তাদের চোখে ধূলো দেওয়া কি এতই সহজ?

সোনার তরী ডুবু-ডুবু দেখে সুচতুর ম্যাডানরা তাড়াতাড়ি নতুন নাবিকের সন্ধান করতে লাগলেন এবং এই অন্বেষণার ফলেই বাংলা নাট্য-জগতে নবযুগের সূর্য্যোদয় সম্ভবপর হ'ল। একমাত্র এই কারণেই ম্যাডানদের নূতন রঙ্গালয় স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি এবং কেবল এই কারণেই বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অবাঙালী ম্যাডানদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জানি, দেশী নাট্যকলার জন্যে ম্যাডানদের এত টুকু মাথাব্যথাও ছিল না। রুচিসম্মত নাট্যকলার চেয়ে মুখরোচক মর্ত্তমান কলাই তাঁদের কাছে ছিল অধিকতর লোভনীয়। তাঁরা ছিলেন নিছক সওদাগর, টাকা-আনা-পয়সা ছাড়া আর কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা তাঁদের নয় এবং শূন্য জমার ঘর পূর্ণ করবার

জন্যেই অবিলম্বে তাঁরা নিয়ে এলেন অধ্যাপক শিশিরকুমার ও নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদকে। একজন অধ্যাপক হ'লেও সৌখীন নাট্য-জগতের অদ্বিতীয় কর্ণধার এবং আর একজন হচ্ছেন তখনকার দিনের অদ্বিতীয় নাট্যকার। ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়েরই সুবিখ্যাত লেখক, সুতরাং দায়ে প'ড়ে তাঁর কাছে ধরনা দিয়ে ম্যাডানরা কোন অসাধারণ কাজ করেননি। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে অধ্যাপক শিশির-কুমারের আবির্ভাব কে কল্পনা করতে পেরেছিল আমরা ঠিক জানি না, তবে ম্যাডানদের আমন্ত্রণ না পেলে শিশিরকুমারেরও হয়তো সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেবার আগ্রহ জাগ্রত হ'ত না। শিশিরকুমারকে আমন্ত্রণ ক'রে ম্যাডানরা যেমন ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় দিলেন, তেমনি আর একদিক দিয়ে করলেন বাংলা নাট্যকলার ক্ষেত্রে নবযুগের বীজ-বপন। ফল যা হ'ল তা দেখতে পাব অবিলম্বেই।

চার

ম্যাডানদের থিয়েটারে দেখতে গেলুম শিশিরকুমারের আলমগীর ভূমিকা। হ্যাঁ, কেবলমাত্র শিশিরকুমারেরই ভূমিকা। কারণ "আলমগীর" পালায় আর যে-সব নট-নটী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন আমার কাছে সুপরিচিত, কাজেই মোল্লাদের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত তাও আমার কাছে অজানা থাকবার কথা নয়। এর আগে আমি শিশিরকুমারের দুইটি মাত্র ভূমিকা ("পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে" ভীম ও ব্রাহ্মণ) দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সেই অভিনয়ে তিনি একটি সরল, স্পষ্টবাদী, দরাজপ্রাণ অথচ উদ্ধত ও কোপনস্বভাব মহাবলিষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্র এমন অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলুম। তাঁর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকাও এতটুকুরও মধ্যে অনেকখানি ভাবের অভিব্যক্তি দেখাতে পেরেছিল (প্রাচীন বয়সেও তিনি এই ছোটকে বড় ক'রে তোলবার শক্তি থেকে বঞ্চিত হননি—প্রমাণ "রিজিয়া"র ঘাতকের ভূমিকা)। একটি ঘোরদর্শন প্রায়-অপার্থিব মূর্ত্তি, মুখে তার ভয়াবহ অমঙ্গলের বাণী। সেই মূর্ত্তি আজও চোখের সামনে দেখছি এবং সেই নিদারুণ "কা কা" রব আজও ধ্বনিত হচ্ছে কাণের কাছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সাধারণ থিয়েটারে যখন "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" প্রথম খোলা হয়, তখন ভীম, ভীষ্ম ও জনৈক ব্রাহ্মণের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন অমৃতলাল মিত্র। তিনি যে বাংলা দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। অন্যান্য নাটকে তাঁর অভিনয় আমি অনেকবার দেখেছি। সেই প্রত্যক্ষ দর্শনের উপরে নির্ভর ক'রে এইটুকু অনায়াসেই বলতে পারি, সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ

নাট্যশিল্পী হিসাবে শিশিরকুমারের আসন তাঁর উপরে। অবশ্য ভীম ও জনৈক ব্রাহ্মণের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় যে উচ্চতর হয়েছিল, এটা অনুমান মাত্র ; কারণ "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" যখন প্রথম খোলা হয় তখন আমি ইহলোকে আগমনই করি নি। আর একটি সত্যও উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ভূমিকায় অমৃতলাল আজ পর্য্যন্ত অতুলনীয় হয়ে আছেন। যেমন "বিল্বমঙ্গলে"র নাম-ভূমিকায়। তেমন অপূর্ব্ব বিল্বমঙ্গল আর দেখলুম না, এ জীবনেও দেখব ব'লে আশা রাখি না। শিশিরকুমারও একবার এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু অমৃতলালের নাগাল ধরতে পারেননি।

ভীম, জনৈক ব্রাহ্মণ ও তারপর আলমগীর। প্রত্যেক ভূমিকাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র,—কারুর সঙ্গে কোন দিক দিয়েই কারুর মিল নেই। এমন কি প্রত্যেকটিই হচ্ছে পরস্পরবিরোধী ভূমিকা। কিন্তু প্রত্যেকের বিচিত্র স্বাতন্ত্র্য আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে রক্ষা ক'রে শিশিরকুমার যে নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দিলেন, তা দেখে আমার আর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, বাংলা দেশে স্বকীয় শক্তির প্রভাবে তিনি গিরিশোত্তর যুগের আর সকলেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অবহেলা করতে পারবেন। তাঁর অভিনয় 'সেন্টিমেণ্ট' বা নিছক চিত্তবৃত্তিই প্রকাশ করে না (প্রধানতঃ যে-জন্যে অমৃতলাল মিত্র ও দানীবাবু এতটা জনপ্রিয় হ'তে পেরেছিলেন), উপরন্তু তার সর্ব্বত্রই প্রকাশ পায় 'ইন্‌টেলেক্ট' বা মনীষা বা বোধশক্তি। এদেশে শিশিরকুমারের আগেও আরো দুইজন যুগান্তকারী অভিনেতা একসঙ্গে ঐ দুটি গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু-শেখর।

"আলমগীর" হচ্ছে একটি বিপুল ভূমিকা, কোন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর—এমন কি কোন কোন প্রথম শ্রেণীর—অভিনেতার পক্ষেও

তার ভার দুঃসহ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এ হেন ভূমিকাও শিশির-কুমার এমন অবলীলাক্রমে অভিনয় করেন যে, তাঁর শক্তির বিশালতা দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। এবং নানা স্থানেই তাঁর অভিনয়ের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' বা মান এতটা চরমে ওঠে যে গিরিশ-যুগেও বিদ্যমান থাকলে তিনি প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ব'লে নিশ্চিতরূপে নিজেই নিজের পথ কেটে নিতে পারতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেবল আলমগীরের স্বপ্ন-দর্শন দৃশ্যের উল্লেখ করতে পারি। এ দৃশ্যটিকে কাঁচি চালিয়ে এখন ঢের ছোট ক'রে ফেলা হয়েছে, কিন্তু আগে বোধ হয় এ দৃশ্যটির স্থায়িত্ব ছিল অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের কম নয়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কাল ধ'রে রঙ্গমঞ্চ অধিকার ক'রে থাকেন ধরতে গেলে কেবল দুইজন শিল্পী—আলমগীর ও উদিপুরী ভূমিকায়। এখানে শিশিরকুমার অধিকাংশ সময়টাই থাকেন উপবিষ্ট অবস্থায়, অথচ এতখানি সময় দর্শকরা প্রায় শ্বাসরোধ ক'রে মাত্র তাঁর ভাষণের ইন্দ্রজালেই একেবারে অভিভূত হয়ে থাকে এবং তাঁর মুখের কথাগুলিই বারংবার সৃষ্টি করে বিচিত্র নাটকীয় ক্রিয়া। আর কোন বাংলা নাট্যাভিনয়ে শিল্পীর সৃষ্ট এমন দীর্ঘকালব্যাপী কুহকের তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে একবার অহীন্দ্র চৌধুরীও আলমগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন চতুর নট, এ ভূমিকাটি নিজের পদ্ধতিতে নূতন ভাবে দেখিয়ে নিজের মানরক্ষা করেছিলেন বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই! কোথাও তিনি শিশিরকুমারের "আলমগীরে"র অসামান্যতার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারেন নি।

ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে "আলমগীর" পালায় শিশিরকুমারের সঙ্গে আরো কয়েকজন সুপরিচিত নট-নটী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মাঝখানে শিশির-কুমারকে দেখিয়েছিল একদল বামনের মধ্যে একজন মহাকায়ের মত। তাঁর অভিনয় আমাকে অভাবিত সৌন্দর্য্যের সন্ধান দান করলে বটে,

কিন্তু তবু এ সত্যও অস্বীকার্য্য নয় যে, সব দিক দিয়ে তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" পালা দেখে যতটা মুগ্ধ ও আশান্বিত হয়েছিলুম, এই "আলমগীর" নাট্যানুষ্ঠান দেখে ততটা হইনি। কেন, তা পরে বলছি।

পাঁচ

আগেই বলা হয়েছে, সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনীত "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" পালাটির মধ্যে সব দিক দিয়ে শিশিরকুমারের কৃতিত্ব যতটা ফুটে উঠতে পেরেছিল, ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে "আলমগীর" নাট্যাভিনয়ে ততটা পারে নি। এর কারণ আছে কয়েকটি। প্রথমত, যে সৌখীন সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন শিশিরকুমার, তার মধ্যে বোধ হয় একজন ছাড়া (নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী) বাকি সকলেই তাঁর কাছ থেকেই যুগোপযোগী নাট্যশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যে অভিনয়-ভঙ্গির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল একটি সুসঙ্গত ঐক্য। কিন্তু ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে শিশিরকুমার ও তাঁর হাতে-গড়া শিষ্য তুলসীচরণ (কামবক্সের ভূমিকায়) ছাড়া আর যে-সব সহ-অভিনেতা ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই পুরাতন দলের শিল্পী। শিশিরকুমারের অভিনয়-ভঙ্গির সঙ্গে তাঁরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি ব'লে যেখানে-সেখানে হয়েছিল ছন্দঃপাত ও রসভঙ্গ।

ঠিক জানি না, তবে খুব সম্ভব "আলমগীরে"র মহলাতে শিশির-কুমারই ছিলেন নাট্যশিক্ষাদাতা। একমাত্র কুসুমকুমারী ছাড়া অন্যান্য অভিনেত্রীরা অল্পবিস্তর পরিমাণে তাঁর শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পেরে-ছিলেন বটে, কিন্তু নবযুগের ভঙ্গিতে অনভ্যস্ত পুরাতন দলের অভিনেতা-দের সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। দীর্ঘকাল রঙ্গালয়ের সম্পর্কে থেকে আর একটি সত্য আমি উপলব্ধি করেছি। বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীরা নাট্যাচার্য্যের কাছ থেকে যতটা সহজে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন, অভিনেতারা তা পারেন না। সুশীলাসুন্দরী, নীরদাসুন্দরী, চারুশীলা,

কৃষ্ণভাবিনী ও মালিনী প্রভৃতি অভিনেত্রীরা মানুষ হয়েছিলেন পুরাতন প্রতিবেশপ্রভাবের মধ্যেই, কিন্তু পরে শিশিরকুমারের সঙ্গে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে তাঁরা নবযুগের ভঙ্গিতেও দিব্য দুরস্ত হ'য়ে উঠতে পেরেছিলেন। একমাত্র কুসুমকুমারীকেই কেউ বাগে আনতে পারেন নি, গত যুগের কৃত্রিম সুর বর্জন করা তাঁর পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত অসম্ভবই থেকে গিয়েছিল। তাই তাঁর মত খ্যাতনামা না হয়েও স্বর্গীয়া মালিনী উদীপুরীর ভূমিকায় তাঁর চেয়ে যথেষ্ট উচ্চশ্রেণীর অভিনয় ক'রে গিয়েছেন। অভিনেত্রীদের মত পুরাতন দলের অভিনেতারাও কেন যে নবযুগের ভঙ্গিতে অভ্যস্ত হ'তে পারেন না, আমি জানিনা তার সঠিক কারণ। হ'তে পারে এর মূলে আছে, অহংমদ বা শক্তি ও রস-বোধের অভাব।

তারপর যা বলছিলুম। "আলমগীর" পালায় নাট্যশিক্ষাদাতা বা প্রয়োগকর্ত্তা রূপে শিশিরকুমারের যে বিশেষ স্বাধীনতা ছিল, অভিনয় দেখে আমার তা মনে হয় নি। কিন্তু ও-কথাটা মনে হয়েছিল "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" পালাটি দেখে। তার পাত্র-পাত্রীর সাজপোষাক, কথোপকথন, ভাবভঙ্গি, প্রবেশ-প্রস্থান, এবং সর্ব্বোপরি সমগ্র অভিনয়ের মূল সুরের মধ্যে ছিল একটি অনাহত সুন্দর ছন্দ। পালাটির মধ্যে যে একটিমাত্র মস্তিষ্কের প্রভাব কাজ ক'রছে, তাও বেশ বোঝা গিয়েছিল।

কিন্তু "আলমগীরে"র মধ্যে ছিল এই সঙ্গতির অভাব। একমাত্র শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভাই তাকে স্মরণীয় ক'রে তুলেছিল। সাজপোষাক এবং দৃশ্যপট প্রভৃতির জাঁকজমকের মধ্যে ইতিহাসকে ব্যঙ্গ ক'রে যত্রতত্র ফুটে উঠেছিল কুবিখ্যাত পার্সী থিয়েটারের প্রভাব। এমন কি নাটকের সঙ্গে যাঁর কোন সম্পর্কই নেই, এমন একজন নর্ত্তক আচম্বিতে মাঝখানে এসে অভিনয়ের ক্রিয়াকে বাধা দিয়ে অদ্ভুত সব

নাচের কসরৎ দেখাতেও ছাড়লেন না, বিশেষভাবে যা আহত করেছিল আমার রসবোধকে। বেশ বুঝলুম, "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে"র মধ্যে একমাত্র যে মস্তিষ্ক আর সকলের উপরে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিল, এক্ষেত্রে সে তা পায় নি। পরে শুনেছি, ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে এই সুযোগ ও স্বাধীনতার অভাব শিশিরকুমার নিজেও অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং কতকটা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ওখানে কাজ ক'রে তিনি সুখী হ'তেও পারেন নি। তাই কিছুদিন কাজ করবার পরই তাঁকে ম্যাডানদের আসর ছেড়ে স'রে দাঁড়াতে হ'ল। যেখানে কলাবিদের আত্মতৃপ্তি নেই, সেখানে ললিতকলার উন্নতি অসম্ভব। ম্যাডানদের উপর-চক্‌চকে শিকল ছিঁড়ে শিশিরকুমার অতি বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলেন। দাবি করলে নিশ্চয়ই তিনি আরো মোটা টাকা লাভ করতে পারতেন। কিন্তু আপাতমধুর অর্থলোভে তিনি ওখানে স্থায়ী হ'লে বাংলা নাট্যজগতে আরো কতদিন পরে হ'ত নবযুগের সূর্য্যোদয়, সেটা অনুমান করা সহজ নয়।

কিন্তু ঐখানে থাকতে থাকতেই তিনি নিজের বিচিত্র প্রতিভার আরো দুটি অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়ে সকলকে বিস্মিত ক'রে দিলেন। আমি চাণক্য ও রঘুবীরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের কথা বলছি। সে সময়ে বাংলা দেশে "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের চাণক্য বলতে বোঝাত একমাত্র দানীবাবুকেই। দানীবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ঐ ভূমিকা গ্রহণ করবার সাহস ছিল না আর কোন অভিনেতার। কিন্তু নবীন শিশিরকুমার ঐ জটিল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেখিয়ে দিলেন, অভিনেতা প্রতিভাধর হ'লে বহু-অভিনীত যে-কোন ভূমিকাকেই সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারেন নূতন রসে ও সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্যে। চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবু প্রকাশ করতেন 'সেন্টিমেণ্ট' বা চিত্তবৃত্তির প্রাধান্য। কিন্তু শিশিরকুমার

'ইন্‌টেলেক্ট' বা মনীষার সাহায্যে চাণক্যকে গ'ড়ে তুললেন নূতন পরি-কল্পনায়। তারপর "রঘুবীর" নাট্যাভিনয়। অর্দ্ধ শতাব্দী আগে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই পালাটি মিনার্ভা থিয়েটারে খুলেছিলেন বটে, কিন্তু নাটক ও তার অভিনয় স্থায়ী বা জনপ্রিয় হয় নি। নাটক হিসাবে "রঘুবীরে"র মৃত্যু হয়েছিল বললেই চলে। আর কোন রঙ্গালয়ই দীর্ঘ-কালের মধ্যে তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। তারপর নাট্যযোদ্ধা শিশিরকুমারই সর্ব্বপ্রথমে নিজের অতুলনীয় প্রতিভার স্পর্শে যে-ভাবে এই মৃত নাটকখানিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুললেন, তা কল্পনাতীত বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ছয়

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ম্যাডান থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ ক'রে শিশিরকুমার পরের বৎসরেও মাসকয়েক ঐখানেই অভিনয় করেছিলেন। সে সময়ে কলকাতায় ছিল আরো তিনটি রঙ্গালয়—'মনোমোহন', 'মিনার্ভা' ও 'ষ্টার'। ঐ তিনটি রঙ্গালয়ের প্রত্যেক শিল্পীরই অবলম্বন ছিল পুরাতন অভিনয়-ভঙ্গি। কিন্তু শিশিরকুমারের অতুলনীয় জনপ্রিয়তা দেখে মিনার্ভা থিয়েটারের বুদ্ধিমান স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মিত্র সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, হালের হাওয়া বইছে কোন্ দিকে। তিনিও দুইজন নবযুগের শিল্পীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন— স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র। দর্শকদের কাছ থেকে তাঁরাও পেলেন সাদর অভিনন্দন।

তারাসুন্দরীর কলাকুশলতায় ষ্টার থিয়েটার 'অযোধ্যার বেগম' খুলে কিছুদিন আসর রাখলে বটে, কিন্তু তারপরেই ধীরে ধীরে ফুরিয়ে এল তার প্রাণশক্তি। মিনার্ভা থিয়েটারের পুরাতন বাড়ী আত্মসমর্পণ করলে অগ্নিকবলে। নেববার আগে প্রদীপের শেষ-ঔজ্জ্বল্যের মত মনোমোহন থিয়েটার "বর্গে বর্গী" নিয়ে কিছুদিন বাজার গরম রাখতে পারলে। ইতিমধ্যেই শিশিরকুমারের অন্তর্দ্ধান হয়েছে এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছেন নবযুগের আর একজন শক্তিশালী শিল্পী নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী। এ-সব হ'ল ১৯২২ খৃষ্টাব্দের কথা।

পরের বৎসরে দেখা গেল ষ্টার থিয়েটারেও নবযুগের মহোৎসব। "কর্ণার্জুন" পালায় দর্শকদের অভিবাদন করলেন তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আরম্ভ হ'ল "মনোমোহনে"র অধঃপতন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের পুনরাগমন। এদিকে শিশির-সম্প্রদায় এবং ওদিকে "ষ্টারে"র আসরে আধুনিক শিল্পীদের নিয়মিত রঙ্গাবতরণ,—দানীবাবুর প্রতিভাকে আশ্রয় ক'রেও "মনোমোহন" দুই দিক থেকে এই প্রবল আক্রমণ সহ্য করতে পারলে না, নূতন নাটক ("ললিতাদিত্য") খুলেও তাকে নিবিয়ে দিতে হ'ল পাদপ্রদীপের আলো। অনতিবিলম্বে ঐ আসরেই "সীতা" নিয়ে দেখা দিলেন শিশিরকুমার। পুরাতনের পতন, নূতনের উত্থান।

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে "সীতা"র অভিনয় একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। আলফ্রেড থিয়েটারেও শিশিরকুমারের প্রধান অবলম্বন ছিল পুরাতন পালা "আলমগীর"ই, তাই তার ভিতরে তিনি নিজের মনের মতন কোন বিশেষত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেননি। কেবল নটরূপে নয়, নাট্যাচার্য্য এবং নাট্যপরিচালক হিসাবেও তাঁর অসামান্য প্রতিভা সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণিত হয় ঐ "সীতা" পালাটির মধ্যেই। স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী নাটকখানি রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু "সীতা"র নাট্যরূপের মধ্যে শিশিরকুমারের হাত ছিল যে কতখানি, তাঁর তখনকার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের তা অজানা নেই। অবশ্য আমাদের নাট্যসাহিত্যে নাটক হিসাবে "সীতা" খুব উচ্চস্থান অধিকার করবে, এমন কথা বলতে পারি না। নাটক হিসাবে তা মোটেই স্মরণীয় নয়। কিন্তু এই নাট্যাভিনয় রসিকসমাজে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল প্রধান দুটি কারণে। শিশিরকুমারের নায়কতায় নবযুগের উপযোগী নূতন একদল শিল্পীর আত্মপ্রকাশ এবং "সীতা"র অভিনব ও অভাবিত প্রয়োগনৈপুণ্য।

শিশিরকুমারের আবির্ভাবের আগে বাংলা নাট্যজগতে বা নাট্য-সমালোচনার মধ্যে প্রয়োগকর্ত্তা বা প্রয়োজক শব্দটির ব্যবহার দেখেছি

ব'লে স্মরণ হচ্ছে না—যদিও অভিধানে ও-দুটি শব্দেরই উল্লেখ আছে। বাংলাদেশে নাট্য-সম্পর্কীয় মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে "প্রয়োগনৈপুণ্য" কথাটিও সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার করেন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই। এবং কথাটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন শিশিরকুমারের অভিনয় সম্পর্কেই। বিলাতের "প্রডিউসার" ও এদেশী প্রয়োগকর্ত্তা বা প্রয়োজকের কর্ত্তব্য হচ্ছে একই—"অভিনয়ার্থ নাটক বা চলচ্চিত্রকে যিনি দর্শনযোগ্যরূপে প্রস্তুত করিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন।"

আগেকার দিনে বাংলা রঙ্গালয়ে নাট্যাচার্য্য ছিলেন, অভিনয়-শিক্ষক ছিলেন, মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন এবং ছিলেন আরো কোন কোন কর্ত্তা, কিন্তু নিজেকে "প্রয়োগ-কর্ত্তা" বলে কেউ কোনদিন দাবি করেন নি। গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুকে মহলায় দেখবার সুযোগ আমার হয়নি বটে, কিন্তু সেকালের আর একজন বিখ্যাত নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুকে আমি মহলা দিতে দেখেছি একাধিক নাটকে। তিনি অভিনয় শিখিয়েছেন, নাটকের ভাব ও মূল কথা সকলকে বুঝিয়েছেন এবং আরো কোন কোন দিক নিয়ে অল্প-বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য বিভাগের কর্ত্তাদের দেখেছি তাঁর সঙ্গে পদে পদে পরামর্শ না ক'রে প্রায় স্বাধীন বা নিরঙ্কুশের মতই কাজ করতে। অবশ্য অমৃতলালকে আমি যখন মহলায় দেখেছি তখন তিনি বার্দ্ধক্যের মধ্যে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন, হয়তো প্রত্যেক দিকে হস্তক্ষেপ করবার মত কার্য্যশক্তি ও উৎসাহ তাঁর ছিল না, কিন্তু এ সত্যও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর যুগের নাট্যাভিনয়েও প্রথম শ্রেণীর অপূর্ব্ব অভিনয়ের সঙ্গে যেখানে-সেখানে দেখা গিয়েছে প্রয়োগদোষের পর প্রয়োগদোষ।

যুগোপযোগী নূতনত্বকে রূপদান করবার জন্যে শিশিরকুমারের আকাঙ্ক্ষা কতখানি প্রবল ছিল, একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিলেই সে কথা

পরিস্ফুট হবে। "সীতা" যখন মহলায় পড়েছে শিশির-সম্প্রদায়ে তখন খ্যাতনামা পুরাতন অভিনেতা যে ছিলেন না, তা নয়। যেমন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, হীরালাল দত্ত ও গোপালদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি। কিন্তু প্রায় বিনা পরিশ্রমেই এঁরা পেতেন উপযুক্ত পারিশ্রমিক। নৃত্যাচার্য্যরূপে আগেকার রঙ্গালয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নামের তুলনা ছিল না। তাঁরই অপূর্ব্ব নৃত্য-পরিকল্পনা "আলিবাবা" প্রভৃতির জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। হাল্‌কা এবং হাস্যরসের নাচে তাঁর মত শক্তিশালী নর্ত্তক বাংলা রঙ্গালয়ে আর দেখা দেন নি। অভিনয়েও তাঁর ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। "বসন্তলীলা" পালায় শিশিরকুমার নৃত্যশিক্ষক ও নর্ত্তকরূপে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন এবং জনতাকেও খুসি করতে পেরেছিল তাঁর নৃত্য-পরিকল্পনা। বিশেষতঃ তাঁর নিজের নৃত্য হয়েছিল "বসন্তলীলা"র অন্যতম প্রধান উপভোগ্য সৌন্দর্য্য। তাঁর শক্তির প্রতি শিশির-কুমারের শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট, নইলে মোটা দক্ষিণা দিয়ে তাঁকে সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ষা করতেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এটুকুও জানতেন যে, নৃপেন্দ্রচন্দ্র উচ্চশ্রেণী শিল্পী হ'লেও পুরাতন যুগের শিল্পী। যে যুগধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে "সীতা" আত্মপ্রকাশ করতে চায়, তার মধ্যে তাঁর পদ্ধতি কিছুতেই খাপ খাবে না। কাজেই সাময়িক ভাবে তিনি পেলেন ছুটি (বেতনের সহিত)। কেবল পুরাতন যুগের অভিনেতা গোপালবাবু পেলেন "সীতা"র জনতা-দৃশ্যে জনৈক নামহীন ব্যক্তির ছোট ভূমিকা।

আগেই বলেছি, "সীতা" নাট্যাভিনয়ের আগে বাংলা নাট্যজগতে "প্রয়োগনৈপুণ্য" কথাটিকে কারুকেই ব্যবহার করতে দেখিনি। হয়তো আগে তার বিশেষ কোন সার্থকতাও ছিল না। গিরিশচন্দ্র ছিলেন বাংলার প্রধান নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য। নট ও নাট্যকার রূপে আজও তিনি যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে আছেন, এ সত্য কেহই

অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু বড়ই বিস্ময়কর বিষয় যে, প্রয়োগকর্ত্তা রূপে তাঁর বিশেষ কোন দানের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। তিনি নাটক রচনা করেছেন, অভিনয়-শিক্ষা দান ক'রেছেন, নিজেও অভিনয় করেছেন, কিন্তু সমগ্র পালাটি সর্ব্বত্র ঠিক বাঁধা সুরের সঙ্গে ছন্দ ও সঙ্গতি রেখে মঞ্চস্থ হ'ল কি-না, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করবার অবসর তিনি পেতেন ব'লে মনে হয় না। ও-সব দিকে তাঁর দৃষ্টি যে ঝাপসা ছিল এমন কথা বলতে পারি না। তিনি ছিলেন সত্যিকার নাট্য-প্রতিভার অধিকারী এবং প্রতিভা কখনো হয় না একদেশদর্শী। সম্ভবত তাঁর যুগে তিনি বা অন্য কেউ ও-সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার মনে করেননি। তাঁদের কাছে প্রধান ছিল কেবল নাটক ও অভিনয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যান্য কর্ত্তব্যের ভার গ্রহণ করতেন মঞ্চাধ্যক্ষ এবং আরো কেউ কেউ।

গিরিশ-যুগে—এমন কি স্বয়ং গিরিশচন্দ্র যখন রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ ও সর্ব্বেসর্ব্বা—নাট্যাভিনয়ের মধ্যে প্রয়োগশিল্পের যে-সব অসঙ্গতি ও দারিদ্র্য দেখেছি, তার ফর্দ্দ দিতে গেলে জায়গায় কুলোবে না। দু-একটি কথার উল্লেখ করতে পারি মাত্র। গুরুগম্ভীর সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকেও থাকত নিছক প্রহসনের উপযোগী নাচ-গান। দৃশ্যপট ও সাজপোষাকের সঙ্গে স্থান-কাল-পাত্রের যোগ থাকত না প্রায়ই। পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীরাও এমন সব ঘর-বাড়ী ও আসবাব-পত্তরের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতেন, যা দেখলে স্তম্ভিত হ'তে পারত ব্যাস-বাল্মীকির অতি-উর্ব্বর কল্পনাও। ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয় সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। হিন্দু-যুগের কথা না হয় তুললুম না, কিন্তু মুসলমান-যুগের স্থাপত্য, সাজপোষাক ও আসবাব-পত্তরের অসংখ্য নিদর্শন উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্ব্বত্রই সুলভ। তবু থিয়েটারি আকবর,

জাহাঙ্গীর, সাজাহান ও ঔরংজীব প্রভৃতি বাদসাহরা যে-সব পোষাক পরতেন, যে-সব সিংহাসনে বসতেন এবং যে-সব জিনিষ ব্যবহার করতেন, দুঃস্বপ্নেও তা সম্ভবপর হ'ত না। আমি নূরজাহানকে বিলাতী জ্যাকেট প'রেও দেখা দিতে দেখেছি। সিরাজদ্দৌলার যুগ তো অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ এবং তিনি তো ছিলেন আমাদের বাংলা দেশেরই নবাব। কিন্তু "সিরাজদ্দৌলা"র অতিবিখ্যাত নাট্যাভিনয়ও নানাদিক দিয়ে ইতিহাসের অনুগত হয়নি। বখতিয়ার খিলজির যুগে রাজা লক্ষ্মণ সেনের হিন্দু ধর্ম্মাধিকারী পশুপতির ভূমিকায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র পরতেন যে পোষাক, অষ্টাদশ শতাব্দীর নবাব সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় দানীবাবুও সেই রকম পোষাক পরলেও তখনকার প্রয়োকর্ত্তার রসবোধ আহত হ'ত না। এবং অতিশয় অসহনীয় ছিল তখনকার ঐকতানের ভয়াবহ উপদ্রব। তা কেবল স্থূলভ ও নিম্নশ্রেণীর ফিরিঙ্গী সঙ্গীতকেই বলপূর্ব্বক আমাদের শ্রবণবিবরে নিক্ষেপ করত না, সেই অসাময়িক ও বিজাতীয় উপসর্গের জন্যে প্রত্যেক অঙ্কের শেষে যবনিকা পড়লেই একেবারে ঘোলো হয়ে যেত নাটকের সমস্ত ঘনীভূত রস, কারণ মূল নাটকীয় ক্রিয়ার সঙ্গে ছিল না তার কোনরকম সম্পর্কই।

"প্রয়োগনৈপুণ্য"? গিরিশ-যুগের দর্শকদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বোধ হয় ও-কথাটির মানে পর্য্যন্ত বলতে পারতেন না। শিশির-কুমারের দ্বারা অনুষ্ঠিত "সীতা" নাট্যাভিনয় দেখবার পর ও-কথাটি কেন সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, একটু পরে তা বলবার চেষ্টা করব।

আট

ইতিমধ্যে আরো দুটো কথা ব'লে নি।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের মৃত্যু হয় ১৩১৫ সালে এবং ১৩১৮ সালে গিরিশচন্দ্রও পরলোকে গমন করেন। উপযুক্ত ছাত্রদের প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকাশের সুযোগ দিতে এবং গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়ায় পরিণত করতে পারেন, বাংলা দেশে এমন নাট্যশিক্ষক আর রইলেন না।

কিন্তু প্রথম প্রথম বিশেষ ক'রে অনুভূত হ'ল না গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর অভাব। গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু যে শিষ্যগুলিকে তৈরি ক'রে গিয়েছিলেন, গুরুদত্ত শিক্ষা ভাঙিয়ে তাঁরা আসর রাখতে পেরেছিলেন বেশ কিছুকাল। সে-যুগের সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা ছিলেন দানীবাবু। গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে তিনি শেষ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন "তপোবল" পালায় বিশ্বামিত্রের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে। এই "তপোবল"ই হচ্ছে গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় অভিনীত শেষ নাটক। গিরিশচন্দ্র তখন মহাপ্রস্থানের পথে পদার্পণ করেছেন বললেও চলে। রুগ্ন ও অক্ষম দেহে তিনি রঙ্গালয়ে মহলায় আসতে পারতেন না, কারুকে কারুকে বাড়ীতে ব'সেই শিক্ষাদান করতেন। "তপোবলে"র অভিনয়ও তিনি দেখে যেতে পারেন নি। মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকখানি খোলবার পর মাস-দুয়েকের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জনৈক বিশেষজ্ঞ বলছেন: "আমরা অর্দ্ধেন্দুশেখরের রিহারস্থালও দেখিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের রিহারস্যালও দেখিয়াছি। নাটকীয় চরিত্রের রূপ-কল্পনায় অর্দ্ধেন্দুশেখর যেরূপ বুঝিতেন, শিক্ষার্থীকে হুবহু তাহারই অনুকরণ করিতে বলিতেন। * * * আদর্শ হস্তলিপি লিখিয়া দিলাম,

তুমি যতটা পারো আদর্শের অনুকরণ কর—এই ছিল অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার মূলমন্ত্র। গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাপ্রণালী ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। কোন নূতন নাটকের শিক্ষাদানের পূর্ব্বে তিনি অনেক সময়েই সমগ্র নাটকখানি সমবেত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মুখে পাঠ করিতেন। এই পাঠের সময়ে শ্রোতারা নাটকের নাটকীয় সকল চরিত্রের ছবি, রূপ ও কল্পনা জীবন্ত ছবির মত দেখিতে পাইত। * * * তাহার পর গিরিশচন্দ্র প্রত্যেক চরিত্রের—বিশেষতঃ নাটকীয় বড় বড় চরিত্রের অভিনয় কিরূপ হইবে, তাহা অনেকটা শিক্ষার্থীদিগের স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই শিখাইতেন। যাহার কণ্ঠে যে ভাবে বলিলে সহজে দর্শকের ও অভিনেতার হৃদয়গ্রাহী হয়, অঙ্গভঙ্গি বা ভাবের অভিব্যক্তি কোন্ অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি, মুখ ও নয়নের ভঙ্গিতে সুন্দর হয়; সুপরিস্ফুট হয়, সেইদিকে তাঁহার খরদৃষ্টি থাকিত, অর্থাৎ অভিনয়-কলা বিকাশে যাহার যতটুকু শক্তি বা সামর্থ্য—তাঁহার সেই শক্তি ও সামর্থ্য যাহাতে অনুশীলনের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। * * * উদাহরণ দিয়া বলি—'জগৎসিংহ' শিখাইতেছেন কি 'আয়েষা' শিখাইতেছেন—তিনি আগে এই চরিত্রদ্বয়ের যত প্রকার interpretation হইতে পারে, দৃশ্যের পর দৃশ্যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিজে সেইভাবে অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দিতেন। পরে তাঁহাদের বলিতেন, "এই বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তির মধ্যে কোন্‌টা কাহার ভাল লাগিল?' যেরূপ উত্তর পাইতেন, শিক্ষাকার্য্য সেইরূপ ভাবেই চলিত।" (গিরিশচন্দ্র: অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত; ৬২২ পৃষ্ঠা।)

হ্যাঁ, প্রথম প্রথম গুরুকে হারিয়েও শিষ্যরা বাহিরের ঠাট কিছুদিন পর্য্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তারপর দানীবাবু বহু ভূমিকায়

দেখা দিয়েছেন এবং যথেষ্ট প্রশস্তিও অর্জ্জন করেছেন গিরিশোত্তর যুগের যুবকদের কাছ থেকে। এমন কি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন হয়নি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জীবনকালে দানীবাবুকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন, পিতার মৃত্যুর পরে তিনি যে সব নূতন ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সেগুলি রীতিমত মামুলি ধাঁচার বা Stereo-typed হয়ে পড়েছিল।

বাংলা নাট্যজগতে 'মনোমোহন-যুগ' এনেছিল অচল অবস্থা। দানীবাবুর নায়কতায় জন-প্রিয়তার দিক দিয়ে মনোমোহন থিয়েটার প্রথম কিছুকাল বাজার মাৎ ক'রে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু পুরাতন কাসুন্দী বার বার কচ্‌লে বেশী দিন লোক ভুলানো চলে না। যুগোপযোগী ভাব ও ভঙ্গির অভাবে 'মনোমোহনে'র অবস্থা ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়তে লাগল। ঠিক সেই সময়ে আমাদের নাট্যজগতে শিশিরকুমারের আবির্ভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল দর্শকদের অন্ধতা। দানীবাবুর শ্রান্ত প্রতিভা আর টাল্ সামলাতে পারলে না। উপযুক্ত নাট্যাচার্য্যের অভাবে মনোমোহন থিয়েটার দীর্ঘ দশ বৎসর—অর্থাৎ প্রায় এক যুগের মধ্যেও একটিমাত্র শক্তিশালী নূতন শিল্পী সৃষ্টি করতে পারে নি। ফলে পুরাতন চাল আর ভাতে বাড়ল না, নিবে গেল "মনোমোহনে"র পাদপ্রদীপ। এবং ওদিকে তার আগেই হয়েছে পুরাতন ষ্টার থিয়েটারের পতন। তারপর উঠল নব-যুগের যবনিকা। বাংলা নাট্যজগতে আবার এলেন যুগোপযোগী নাট্য-শিক্ষক।

নয়

যে যুগটাকে আমরা বাংলা নাট্যজগতের নবযুগ বলি, তার পত্তন হয় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পেশাদার নটরূপে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। শিশিরকুমার প্রচুর সুখ্যাতি এবং প্রভূত কুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। নাট্যকলায় উচ্চশিক্ষিত ও নিরপেক্ষ সমালোচকরা বলেছেন, আধুনিক ভারতে অভিনেতা শিশিরকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কিন্তু যাঁরা বহু-কালের ব্যবহারে জরাজীর্ণ অভিনয়-ভঙ্গিতে অভ্যস্ত হয়ে নূতনকে আমল দিতে নারাজ, কোনরকম যুক্তিই তাঁদের শিশিরকুমারের ভক্ত ক'রে তুলতে পারে নি। তাঁদের মনের গতি হচ্ছে অনেকটা ওস্তাদী সঙ্গীতের তথাকথিত ভক্তদের মত—কিছুতেই যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মহিমা বুঝতে পারেন না। সঙ্গীতজগতের এই দলের কোন কোন কেষ্টো-বিষ্টুর চৈতন্যোদয়ের জন্যে দৈনিক "বসুমতী"তে আমি দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা ক'রে দেখিয়েছিলুম যে, এঁদের একদেশদর্শী মতামত হচ্ছে কতখানি ভিতর-ফোঁপরা।

কেবল নাট্যকলার ক্ষেত্রে নয়, কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র বা নৃত্য—অর্থাৎ ললিত কলার সমস্ত ক্ষেত্রেই যুগে যুগে হয় গতি ও ভঙ্গির পরিবর্ত্তন। কোন শক্তিই কোনদিন এ স্বাভাবিক নিয়মকে বাধা দিতে পারে নি, কারণ এই পরিবর্ত্তন হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী। বিশেষজ্ঞকে এই সত্যটা বিশেষ ক'রে বোঝাবার দরকার করে না, কিন্তু সাধারণ পাঠককে বোঝাবার জন্যে একটিমাত্র সহজ দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

ধরুন সাহিত্য-জগতের বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের কারুর মনেই কোন সন্দেহ নেই। আমরা

চিরদিনই বাংলা সাহিত্যের গুরু ব'লে তাঁকে পূজা ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য। কিন্তু বর্ত্তমান যুগেও যদি কেউ বঙ্কিমের ভাষা ও ভঙ্গি হুবহু অবলম্বন ক'রে নূতন উপন্যাস রচনা করেন, তাহ'লে তাকে কি আদর করবে একালের পাঠকরা? যুগধর্ম্মের অগ্রগতি বুঝে প্রতিভাবান বঙ্কিমচন্দ্র কি নিজের জীবদ্দশাতেই নিজের উপন্যাসের ভাষা ও ভঙ্গিকে পরিবর্তিত করেন নি? যদি কেউ "না" বলেন, তবে তাঁকে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" এবং তাঁর সর্ব্বশেষ উপন্যাস "সীতারামে"র দিকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করি।

আর্ট হচ্ছে মানুষের মত। তারও শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে এবং তারপর আবার আছে তার নূতন রূপে নূতন বেশে নব জন্ম। যতই তর্ক করুন, যতই অস্বীকার করুন, কেউ ঠেকাতে পারবেন না এই অবশ্যম্ভাবিতাকে। মাইকেলের ভাষা ও ভঙ্গি আজ আর চলবে না। এমন দিন আসবে যেদিন রবীন্দ্রনাথেরও ভাষা ও ভঙ্গি হবে অচল। ঠিক এই নিয়ম অনুসারেই নাট্যজগতেও গিরিশ-যুগে অবলম্বিত অভিনয়-ভঙ্গি নবযুগের উপযোগী হ'তে পারে নি। নবযুগেই বা বলি কেন, গিরিশ-যুগেই আমাদের নাট্য-জগতে পরস্পরবিরোধী দুইটি অভিনয়-ভঙ্গির উৎপত্তি হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র অভিনয়ে সুর পছন্দ করতেন, অর্দ্ধেন্দুশেখর করতেন না। গিরিশ-শিষ্য দানীবাবু এবং অর্দ্ধেন্দু-শিষ্য তারক পালিত, দু'জনেই ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর অভিনেতা। কিন্তু দুইজনের অভিনয়-ভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

গিরিশচন্দ্রের পরলোক গমনের কিছুকাল পরে আমাদের রঙ্গালয়ে যদি কোন প্রথম শ্রেণীর নূতন প্রতিভার আবির্ভাব হ'ত, তাহ'লে বহু-কাল পূর্ব্বেই আমাদের অভিনয়ের ধারা বয়ে যেত কোন নূতন প্রণালী দিয়ে। কিন্তু তা সম্ভবপর হয় নি ব'লেই বহুকাল ধ'রে আমাদের দায়ে

প'ড়ে সহ্য করতে হয়েছিল এমন এক অতি-ব্যবহৃত অভিনয়-ভঙ্গিকে, মস্তিষ্কের সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। নূতন কোন ভূমিকা পেলে তখনকার বড় বড় অভিনেতারাও নূতন ভাবে তার ধারণা করতেন না, তাঁদের দ্বারা পূর্ব্বে অভিনীত কোন পুরাতন সদৃশ ভূমিকার ছাঁচে ফেলে নূতনকে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন। এটা আমার কাণে শোনা কথা নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি, কারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অন্দর-মহলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রায় তিনযুগব্যাপী।

শিশিরকুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে বাংলা রঙ্গালয়ে প্রচলিত অভিনয়-ভঙ্গির মধ্যে একটা নূতন পরিবর্ত্তন দেখা দেয়, এ সত্যটা তাঁর শত্রুরাও নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবেন না। শিশিরকুমারের প্রথম আবির্ভাব ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে "আলমগীর" নাট্যাভিনয়ে। কিন্তু তখন তিনি স্বাধীন নন অভিনয় করতেন পরের রঙ্গালয়ে, পুরাতন নট-নটীদের সঙ্গে। তাঁর নিজের হাতে-গড়া নূতন শিল্পী ছিলেন দুইজন মাত্র—তুলসীচরণ ও প্রভা। নিজে নাট্যাচার্য্য হয়ে সমস্ত পালাটিকে স্বেচ্ছামত গ'ড়ে তোলবার উচিতমত সুযোগ তখনও তিনি পান নি। নিজের নূতন ভঙ্গির অভিনয় দেখিয়ে তিনি অভিভূত দর্শকদের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—এইমাত্র। নাট্যশিক্ষাদাতা রূপে তাঁর আসল স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল আরো কিছুদিন পরে।

দশ

ম্যাডানদের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন শিশিরকুমার। বেশী টাকার লোভে অন্য কোন রঙ্গালয়ে যোগ দেবার জন্যে নয় (যা তিনি অনায়াসেই করতে পারতেন, কারণ তাঁহার অভাবিত জনপ্রিয়তা ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তখন সহরের সব রঙ্গালয়ের মালিকেরই চোখ খুলে গিয়েছে, শিশিরকুমারের পক্ষে লোভনীয় যে কোন সর্ত্তে তাঁরা তাঁকে গ্রহণ করবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতেন)। নিছক অর্থলোভেই শিশিরকুমার যে পেশাদার রঙ্গালয়ে যোগ দিয়েছিলেন, এটা যাঁরা মনে করবেন তাঁরা ভুল করবেন। যে সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ তাঁকে সাধারণ রঙ্গালয়ের আসরে আনয়ন করেছিল তা হচ্ছে গভীর নাট্যকলানুরাগ। প্রত্যেক শিক্ষিত ও রসিক বাঙালীর মত তিনিও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বাংলা নাট্যজগতে এসেছে অজন্মার যুগ এবং পুরাতন হয়েছে জরাজর্জ্জর, এখানে দরকার এখন বলিষ্ঠ নবযুগের নূতন সৃষ্টি, নূতন ভঙ্গি, নূতন পরিকল্পনা।

পরের রঙ্গালয়ে পরাধীন হয়ে চাকরি করতে করতে কেউ নিজের স্বাধীন মস্তিষ্ককে বা চিন্তাশক্তিকে, সৃষ্টিক্ষমতাকে ও রসবোধকে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ করতে পারে না। সেইজন্যেই তিনি ম্যাডানদের সম্পর্ক ছাড়লেন। এবং সেইজন্যেই তিনি তখনকার আর কোন অধঃপতিত বাংলা রঙ্গালয়েও যোগদান করলেন না। কিন্তু তা ব'লে তারপর হাত-পা গুটিয়ে ব'সেও রইলেন না। তখন বাংলা দেশে নাট্যজগতের আর একটি নূতন বিভাগ সবে খোলা হয়েছে—চলচ্চিত্র বিভাগ। এই শিশু-শিল্পটি নামে চলচ্চিত্র হ'লেও চলতে শিখেছে তখন কেবল হামাগুড়ি দিয়ে। সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে গিয়ে শিশিরকুমার কিছুদিন এই

শিল্পটিরই চর্চ্চা করতে করতে লাগলেন। তারই ফলে "তাজমহল চিত্র-প্রতিষ্ঠান" থেকে ছবির পর্দ্দায় আত্মপ্রকাশ করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কাহিনীর চিত্ররূপ—"আঁধারে আলো"। ঐ চিত্রাভিনয়ের পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা ছিলেন শিশিরকুমারই। এদেশে তার আগে আরো তিন-চারখানি চলন্ত ছবি পর্দ্দার গায়ে ফুটে উঠেছিল বটে, কিন্তু সেগুলির কাহিনী ও নাটকীয় মূল্য একেবারেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। সেগুলি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে পেরেছিল কেবলমাত্র আজব নূতনত্বের জন্যে। লোকে তখন চলন্ত বিলাতী ছবি দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু চলন্ত বাংলা ছবির আবির্ভাব তখনও ছিল একটা অভিনব বস্তুর মত, তাই চলচ্চিত্রক্ষেত্রে অচলও হ'ত চলমান।

*　　*　　*　　*

বাংলা চিত্রজগতে শিশিরকুমারই সর্ব্বপ্রথমে প্রতিভাবান আধুনিক লেখকের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য প্রস্তুত করেন। কেবল তাই নয়, আজ বিভিন্ন চিত্র-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা শরৎচন্দ্রের গল্পের ভাণ্ডার আক্রমণ ক'রে প্রায় খালি ক'রে এনেছেন বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে চিত্রজগতের প্রাথমিক পরিচয়ের সুযোগ ক'রে দেন তিনিই। এবং বাংলা চিত্রজগতে যাঁরা সর্ব্বপ্রথমে গম্ভীর ও উচ্চতর শ্রেণীর নাট্যরসাশ্রিত অভিনয়-ভঙ্গির সূত্রপাত করেন তাঁদের মধ্যে শিশিরকুমার ও নরেশচন্দ্র মিত্রের নামই সর্ব্বাগ্রে মনে আসে। একালের অধিকাংশ চিত্রদর্শকই এই সত্যের সঙ্গে পরিচিত নন।

কিন্তু পটের চেয়ে পাদপ্রদীপের দিকেই শিশিরকুমারের মনের টান বেশী। আর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পক্ষে রঙ্গমঞ্চই যে যোগ্যতর ক্ষেত্র, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ছবির মহলে সর্ব্বেসর্ব্বা হচ্ছেন পরিচালক, নট-নটীদের তিনি ব্যবহার করেন পুতুল-নাচের পুতুলের মত। কেবল-

মাত্র তাঁরই হুকুমবরদার হয়ে তাঁদের মেপে মেপে হাসতে হবে, কাঁদতে হবে, মুখ ভ্যাংচাতে হবে। ছবির গল্পের ভিতরে দর্শকরা লাভ করে ধারাবাহিকতা, কিন্তু ছবির অভিনেতারা জানেন, তাঁদের অবলম্বিত আর্টের মধ্যে কিছুমাত্র ধারাবাহিকতা নেই, তাঁরা ক্রমিক ভাবে সাজানো দৃশ্যের পর দৃশ্যে ধাপে ধাপে উপরে উঠে চরম মুহূর্ত্তটিকে স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ পান না। সর্ব্বশেষ দৃশ্যের অংশবিশেষ নিয়ে হয়তো সর্ব্বপ্রথমেই তাঁরা ভাবের (তাও আংশিক) অভিব্যক্তি দেখাতে বাধ্য হন। এমন কি চিত্রনাট্যের কাহিনী পুরোপুরি না জেনেও কেবল পরিচালকেরই মুখ চেয়ে ও হুকুম মেনে তাঁরা অভিনয় করেন, তাই তাঁদের কাজ উল্লেখযোগ্য হ'তে পারে না। আমি স্বচক্ষে চিত্র-নটদের এমনি অন্ধের মত কাজ করতে দেখেছি। স্বাভাবিক নাটক ও অভিনয়-কলার জন্ম ও পরিণতি কি-রকম? ফুলের মত। আগে কুঁড়ি। তারপর দেখা দিলে পাপড়ি। তারপর পাপড়িগুলি ফুটল একে একে একটু একটু ক'রে। তারপরেই হ'ল গোটা ফুলটির জন্ম এবং পরিণতি। কিন্তু ছবির রাজ্য হচ্ছে উল্টো রাজার দেশ। সেখানে ফোটা ফুলের দরকার হয় হয়তো সর্ব্বপ্রথমে, এবং কুঁড়িকে আনতে হয় সর্ব্বশেষে। কোন ধারাবাহিকতা নেই, অথচ ধারাবাহিকতাই হচ্ছে সত্যিকার অভিনয়-কলার প্রাণ। ছবির পরিচালক শ্রেষ্ঠ শিল্পী হ'তে পারেন, কিন্তু অভিনেতারা শিল্পী হিসাবে তাঁর চেয়ে ঢের নিকৃষ্ট স্থান অধিকার ক'রে থাকেন। রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত নট-নটীদের নামের মহিমা কাজে লাগাবার জন্যে তাঁদের চিত্রজগতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় বটে, কিন্তু সেখানে গিয়ে যে তাঁদের প্রতিভা স্ফূর্ত্তিলাভ করে এবং তাঁরা নিজেরাও পান যথার্থ আত্মপ্রসাদ, এমন বিশ্বাস আমার নেই। আমি অভিনয় করি না, কাজেই অভিনেতাদের সঠিক মনের কথা বলতে গিয়ে

সহজ বুদ্ধিই ব্যবহার করলুম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছবির জগতে ব'সেও শিশিরকুমারের সাগ্রহ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সাধারণ রঙ্গালয়ের দিকেই —কেবল যথার্থ সুযোগের অভাবেই সেখানে গিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে পারেন নি। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ চিরদিনই নিজের সুযোগ নিজেই ক'রে নেন এবং শিশিরকুমারও সুযোগ লাভ করলেন।

এগারো

কলকাতার ইডেন গার্ডেনে একটি বৃহৎ প্রদর্শনী খোলা হয়। শিশিরকুমার সেখানে নিজের সম্প্রদায় নিয়ে অভিনয় করবার জন্যে আহূত হন। শিশিরকুমার বরাবরই কাব্যপ্রিয় ও সাহিত্যরসিক। যাঁরা তাঁকে ভালো ক'রে চেনেন তাঁরাই জানেন, পাদপ্রদীপের মায়া ছেড়ে কলম ধরলে তিনি অনায়াসেই একজন প্রথম শ্রেণীর লেখকরূপে খ্যাতিলাভ করতে পারতেন। প্রদর্শনীতে অভিনয়ের জন্যে তিনি এমন একখানি নাটক নির্ব্বাচন করলেন, যা বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় নাট্যকারের দ্বারা বহুকালপূর্ব্বে রচিত হ'লেও সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা তার দিকে নজর দেওয়া দরকার মনে করেন নি। একখানি বাংলা মাসিকপত্র ছিল নাম তার "নবপ্রভা"। সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। তাঁরই ছোট ভাই কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" নাট্যকাব্য আমরা সেই পত্রিকাতেই পাঠ করেছিলুম।

বাংলা নাট্যজগতে যখন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতুলনীয়, সে-সময়ে তিনি ইচ্ছা করলেই "সীতা" পালাটি মঞ্চস্থ করতে পারতেন। কিন্তু কোনদিনই তিনি সে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। তার প্রধান কারণ বোধ হয়, তিনি ভালো ক'রেই জানতেন যে, সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে সাহিত্যরসপ্রধান নাট্যকাব্য জীবন্ত ও পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারেন এমন নট-নটীর অত্যন্ত অভাব। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে যে নাটককে নিছক সাহিত্যের গণ্ডীর বাইরে আসতে দেননি, শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চের উপর এনে দাঁড় করাতে চাইলেন সেই "সীতা"কেই। এখেকেই বেশ বোঝা যাবে, গোড়া থেকেই আত্মশক্তি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন কতখানি সচেতন।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি কথা ব'লে নি। সাধারণ বাংলা রঙ্গমঞ্চ সাধারণভাবে অভিনয় করলে যে "সীতা"র মর্য্যাদা যথার্থভাবে রক্ষা করতে পারে না, এ সত্যটাও প্রমাণিত হ'তে বেশী দেরি লাগেনি। দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" প্রদর্শনীতে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হবার পরে আর্ট থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এই পালাটি শিশিরকুমারের হাত থেকে কেড়ে নেন। কিন্তু নিজেরাও "সীতা" মঞ্চস্থ করতে পারেন নি।*

"সীতা" নাটক তো নির্ব্বাচিত হ'ল, কিন্তু শিশিরকুমার অভিনয় করবেন কাদের নিয়ে? তখন তিনি একটি নূতন সম্প্রদায় গড়বার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। 'ওল্ড ক্লাবে'র কয়েকজন অবৈতনিক নট এসে তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন—যেমন স্বর্গীয় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, ললিত-মোহন লাহিড়ী ও রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। আরো এলেন স্বর্গীয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, স্বর্গীয় তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবি রায় ও স্বর্গীয় জীবন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। এমন কি মহলার প্রথম দিকে স্বর্গীয় নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীও সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিলেন; তিনিও তখন শিশিরকুমারের পরেই ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে প্রধান নটরূপে উপর-উপরি কয়েকখানি নাটকে বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় ক'রে আবার বাস করছিলেন যবনিকার অন্তরালে। শিশির সম্প্রদায়ে তাঁর জন্যে নির্ব্বাচিত হয়েছিল শম্বুকের ভূমিকা। একদিন কি দুইদিন তিনি মহলাও দিয়েছিলেন। কিন্তু পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্যে পরে তিনি আর আসতে পারেন নি।

* ১৩৩২ সালের "নাচঘরে" (২য় বর্ষ, ১৯ সংখ্যা) প্রকাশিত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর একখানি পত্রে জানা যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কাছে শিশির কুমার অভিযোগ করেছিলেন যে: "ষ্টার থিয়েটার 'সীতা' লইল অভিনয় করিবার জন্য নয়, তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য।" শিশিরকুমারের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নি।

সম্প্রদায়ের জন্যে অভিনেত্রী সংগ্রহ করা হ'ল সাধারণ রঙ্গালয় থেকেই। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গীয়া মালিনী, শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী, স্বর্গীয়া প্রভা ও শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল) প্রভৃতি সুপরিচিতা বা উদীয়মানা নটীরা।

এঁদের নিয়েই প্রথম নিজস্ব শিশির-সম্প্রদায়ের পত্তন হয়। এবং পরে প্রধানতঃ এঁদের সঙ্গেই কাজ ক'রে শিশিরকুমার নিজের অপূর্ব্ব প্রতিভার সাহায্যে বাংলা নাট্যজগতে আনেন যুগোপযোগী নাট্য-প্রয়োজনা ও অভিনয়-ধারা। প্রত্যেক অভিনেতাই নূতন; তাই শিশিরকুমারের শিক্ষাপদ্ধতির মর্য্যাদা রাখতে গিয়ে তাঁদের পুরাতন বা বহুদিনের অভ্যাসের জন্যে পদে পদে বাধা পেতে হয় নি। ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে শিশিরকুমারের সহকারী ছিলেন গত যুগের—অর্থাৎ গিরিশোত্তর যুগের প্রাণহীন শিক্ষায় অভ্যস্ত কয়েকজন সুপরিচিত অভিনেতা. ধাতস্থ হ'ত না তাঁদের নূতন পদ্ধতি। এটা বুঝেই তিনি নিজের দলে কোন সেকেলে অভিনেতাকে গ্রহণ করেন নি।

প্রদর্শনীতে দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"র অভিনয় আরম্ভ হ'ল। ক্ষুদ্রতর, অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ, কিন্তু তার মধ্যেই শিশিরকুমারের প্রয়োগকৌশল প্রকাশ পেলে কল্পনাতীতরূপে। রসিকরা লাভ করলেন উচ্চতর মস্তিষ্কের খোরাক, গিরিশোত্তর যুগে যার অভাব অনুভূত হ'ত বিশেষ ভাবেই। দেখতে দেখতে অভিনয় অত্যন্ত জ'মে উঠল, প্রতি রাত্রেই পরিপূর্ণ হয়ে যায় প্রেক্ষাগৃহ। শিশিরকুমার রামের ভূমিকায় অমৃতোপম অভিনয় ক'রে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করলেন যে, নাট্যকারের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দার্থ বুঝে কাব্যরস পরিবেষণ করলে সাধারণ দর্শকরাও নাট্যকাব্য উচিতমত উপভোগ করতে পারে।

আবার মোড় ঘুরে গেল। প্রদর্শনীতে সর্ব্বসাধারণের অভিনন্দন

লাভ ক'রে শিশিরকুমার অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তখনকার মত ভুলে গেলেন চলচ্চিত্রের কথা। স্থির ক'রে ফেললেন, নবগঠিত নিজস্ব সম্প্রদায় নিয়ে আবার স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অবস্থা তখন আশাপ্রদ নয়। মিনার্ভার বাড়ী পুড়ে গিয়েছে এবং উঠে গিয়েছে ম্যাডানদের থিয়েটার। আলো জ্বলছে কেবল দুটি রঙ্গালয়ে। এক মনোমোহন থিয়েটার, কিন্তু তারও তখন উঠি-উঠি অবস্থা। আর এক 'ষ্টারে'র আসরে আর্ট থিয়েটার, সে নৌকো ভাসিয়েছে নূতন ও পুরাতনের দোটানায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকারই মধ্যে, কাজেই আসরে নেই জনতার অভাব।

বারো

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের পিছনে হ্যারিসন রোডের উপরে পার্সীদের আলফ্রেড থিয়েটার। তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বোম্বাই-মার্কা উৎকট অভিনয়ের জন্যে। কিন্তু যাদের জন্যে সে-রকম অভিনয়ের ব্যবস্থা হ'ল, তারাও তা বেশীদিন সহ্য করতে রাজি হয় নি। তারপর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটার ছেড়ে স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এখানে বাসা বাঁধেন। রঙ্গালয়ের নাম হয় গ্রাণ্ড থিয়েটার। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের সে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আলফ্রেডের অবস্থানও তখন বাঙালী দর্শকদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। তার আশে পাশে বাস করত গুণ্ডা ও নিম্নশ্রেণীর লোক। দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকত। এখন ওখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা আগেকার চেয়ে উন্নত হয়েছে বটে, কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্য একেবারে যায় নি। যে কারণেই হোক অমরেন্দ্র-নাথের পর দীর্ঘকালের মধ্যে আর কোন বাঙালী ওখানে অভিনয়ের আসর পাততে সাহসী হন নি। ম্যাডানরা যখন আলফ্রেডের অধিকারী, তখন কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার থেকে বাঙালী নট-নটীদের সরিয়ে ঐখানে নিয়ে আসা হয়। অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু সে আসরও জমে নি—মাস-কয়েকের মধ্যেই নিবে যায় পাদপ্রদীপের আলো।

আর কোথাও মাথা গলাবার ঠাঁই না পেয়ে শিশিরকুমার স্থির করলেন, এই কুবিখ্যাত স্থানেই তিনি নিজের সম্প্রদায়কে মঞ্চস্থ করবেন। সে হচ্ছে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কথা। তাঁর হাতে তখন 'একজিবিসানে' প্রদর্শিত ও বহু-প্রশংসিত দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" প্রস্তুত হয়েই আছে, তাই নিয়েই আবার তাঁর আত্মপ্রকাশের কথা। অভিনয়ের তারিখ

পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপিত হ'ল। ষ্টার থিয়েটারে আর্ট সম্প্রদায় তখন খুব ঘটা ক'রে অভিনয় চালাচ্ছেন। শিশিরকুমারের মত প্রবল প্রতিযোগীকে সাধারণ নাট্যজগতে আবার প্রবেশোদ্যত দেখে আর্ট সম্প্রদায়ের কেষ্টো-বিষ্টুদের কতখানি চিত্তপীড়া উপস্থিত হয়েছিল তা আমি জানি না, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেও তাঁরা ত্রেতার রাবণের মতই চুপি চুপি করলেন "সীতা" হরণ। অর্থাৎ শিশিরকুমারের অজ্ঞাতসারেই দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমারের কাছ থেকে "সীতার অভিনয়-স্বত্ব" ক্রয় ক'রে ফেললেন। প্রেমে আর যুদ্ধে নাকি কিছুই অন্যায় নয়। কিন্তু শিশিরকুমার কারুর বিরুদ্ধেই যুদ্ধঘোষণা করেন নি, আর্ট সম্প্রদায়ের হোমরা-চোমরা কর্ত্তাদের মত তাঁর টাকার জোরও ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন কেবল নাট্যলক্ষ্মীর পূজাবেদীর সামনে নিজের জন্যে একটুখানি দাঁড়াবার জায়গা। কিন্তু আর্টের কর্ত্তারা তাঁকে দিতে রাজি ছিলেন না সেটুকু সুবিধাও। "কর্ণার্জুনে"র দৌলতে তখন তাঁদের কোঁচড় ভ'রে উপচে পড়তে চাইছে, তাতেও তাঁরা তুষ্ট নন, থিয়েটারি বাজারে আর কেউ যে এসে নূতন পসরা সাজিয়ে বসে এটা তাঁরা পছন্দ করলেন না, তাই ছলে-বলে-কৌশলে একজন নিরপরাধ দরিদ্র কিন্তু প্রতিভাবান শিল্পীকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হ'ল, তিনি প্রতিভার অধিকারী।

অভিনয়ের তারিখ নির্দ্দিষ্ট, তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত, কিন্তু অভিনয়ের নাটক হ'ল হাতছাড়া। ঘাটে এসে বুঝি শিশিরকুমারের ভরাডুবি হয়। কিন্তু তিনিও দমলেন না—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। শিল্পী ও সাহিত্যিক বন্ধুরাও তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। সকলে মিলে তাড়াতাড়ি এক গানের মালা গেঁথে বিজ্ঞাপিত উদ্বোধন-রাত্রে

দর্শকদের উপহার দেবার ব্যবস্থা হ'ল—সেই গানের মালা বা পালাটির নাম দেওয়া হ'ল "বসন্তলীলা"। তাতে ভূমিকা গ্রহণ করলেন নবীন ও প্রবীণ গায়ক, নর্ত্তক, নট ও নটীরা। শিশিরকুমার নিজেও জনতার একজন হয়ে মঞ্চের উপরে দেখা দিলেন। আর্টের ধুরন্ধরদের মনোবাসনা পূর্ণ হ'ল না, শিশিরকুমার নিশ্চিতরূপেই আত্মপ্রকাশ করলেন এবং উচ্চতর শ্রেণীর কলারসিক ও সাধারণ দর্শকরা একবাক্যে "বসন্তলীলা"কে দিলেন সুন্দর অভিনন্দন ।

তেরো

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ। মনোমোহন থিয়েটার আর্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রেও কোনরকমে সন্ধ্যাদীপ জালিয়ে রেখেছিল বটে, কিন্তু আলফ্রেড থিয়েটারে শিশিরকুমারের পুনরাবির্ভাব তার পড়ো-পড়ো অবস্থায় হয়ে উঠল শেষ ধাক্কার মত। নিবে গেল তার সন্ধ্যাদীপ। তারপর "আর্টে"র কর্তৃপক্ষের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে (কারণ এ ব্যাপারেও তাঁরা বাধা দেবার জন্যে অল্প চেষ্টা করেন নি) সেখানে অভিনয় করবার অধিকার পেলেন শিশিরকুমারই। রঙ্গালয়ের ভাড়া ধার্য্য হ'ল মাসিক তিন হাজার টাকা।

"আর্টে"র কর্ত্তৃপক্ষ শিশিরকুমারকে দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" থেকে বঞ্চিত ক'রে লাভ করলেন কেবল শূন্যগর্ভ আত্মপ্রসাদ। তাঁদের নিজেদের কোন উপকার তো হ'লই না, উপরন্তু 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ' করবার সেই অপচেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল, কারণ তাঁরা হারালেন জনসাধারণের অনেকখানি সহানুভূতিই এবং তাঁরা যা হারালেন পেলেন তা শিশিরকুমার। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার তিনি অবলম্বন করলেন সীতাকেই। নাট্যকাব্য "সীতা" দ্বিজেন্দ্রলালেরই লেখনীর দান, কিন্তু আখ্যানবস্তু যখন পৌরাণিক, তখন তার উপরে আছে সকলেরই সমান অধিকার। স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তখনও কোন নাটক রচনা করেন নি বটে, কিন্তু তাঁর রচনাশক্তি আছে জেনে শিশিরকুমার তাঁকেই আহ্বান করলেন সীতার কাহিনী নিয়ে নূতন একটি পালা রচনার জন্যে। এজন্যে কেবল প্রেরণা নয়, শিশিরকুমারের কাছ থেকে যোগেশচন্দ্র নাটক রচনা সম্পর্কীয় কত মূল্যবান ইঙ্গিত

ও সৎপরামর্শ পেয়েছিলেন, আমাদের তা অজানা নেই। রচনা যোগেশচন্দ্রের বটে, কিন্তু নূতন নাটকখানির 'প্ল্যান' বা পরিকল্পনা শিশিরকুমারেরই।

কেবল অভিনয়, দৃশ্যসৌন্দর্য্য ও প্রয়োগকৌশল নয়, তৌর্য্যত্রিকের (নৃত্যগীতবাদ্য) প্রত্যেক দিক দিয়ে তাঁর সেই অভিনব আবির্ভাবকে যথার্থরূপে নবযুগের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন শিশিরকুমার। দৃশ্যপট ও সাজপোযাক পরিকল্পনার জন্যে আহ্বান করলেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়কে। তাঁর আগে তাঁর মত ভারতীয় চিত্রকলায় সুদক্ষ আর কোন চিত্রশিল্পী বাংলা নাট্যজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন নি। স্বর্গীয় শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হ'লেন তাঁর সুযোগ্য সহকারী। সঙ্গীতাচার্য্য রূপে আহ্বান করলেন স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে'কে। কৃষ্ণচন্দ্রের মত জনপ্রিয় বিখ্যাত গায়কও সাধারণ রঙ্গালয়ে ইতিপূর্ব্বে যোগদান করেন নি। গান রচনার জন্যে আহ্বান করলেন আমাকে এবং নৃত্য পরিকল্পনার ভার দিলেন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও আমার উপরে। প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত প্রভৃতির জন্যে আহূত হ'লেন পরে কলকাতার বেতারের অগ্রনায়ক নৃপেন্দ্র মজুমদার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শিশিরকুমার যাঁদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সকলেই এসেছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে থেকে। অভিনেতাদের সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায়। আড়ালে আড়ালে থেকে তাঁকে সাহায্য করতেন আরো কয়েকজন বন্ধু। যেমন স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। "সীতা"র কর্ম্মীগণ সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিবেশ-প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন ব'লেই ঐ নাট্যানুষ্ঠানের কোথাও দেখা যায় নি অতীতের রোমন্থ।

সাধারণ রঙ্গালয়ের একজন মাত্র শিল্পীকে সম্প্রদায়ের মধ্যে লাভ করবার জন্যে শিশিরকুমারের ছিল সাতিশয় আগ্রহ। তিনি হচ্ছেন গিরিশোত্তর যুগের অদ্বিতীয় অভিনেতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বা দানীবাবু। তিনি তখন নাট্যজগতের বাইরে ব'সে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু দানীবাবু তাঁর প্রস্তাবে রাজি হন নি। তাঁর নারাজ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন: "সীতা অভিনয়ের পূর্ব্বে, মনোমোহন থিয়েটার দখল লইবার পরে, শিশিরকুমার দানীবাবুকে নাট্যাচার্য্যরূপে থিয়েটারে আনিয়া তাঁহার সহযোগিতায় থিয়েটার চালাইতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে শিশিরকুমার তাঁহার বন্ধু কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সহিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু (এখন স্বর্গত। তিনি গিরিশচন্দ্রের নিকট-আত্মীয় এবং সুপরিচিত সাহিত্যিক) মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকেও অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু জীর্ণ পুরাতন, গ্লানি ও পরাজয়েও নূতনের বশ্যতা স্বীকার করিল না, তিনি গৃহে বসিয়াই রহিলেন। এই সম্বন্ধে দানীবাবু বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলিতেন, 'শিশিরবাবু আমাকে নিতে এসেছেন। আমাকে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে তারপরে নিতে এসেছেন। এ অবস্থায় আমি কি যেতে পারি?' আশাতিরিক্ত বেতন ও সম্মানের লোভ পরিত্যাগ করিয়াও তিনি গৃহেই বসিয়া রহিলেন।"

এ সম্বন্ধে দু-একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো। প্রথমত, শিশিরকুমার নাট্যাচার্য্যরূপে দানীবাবুকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, এটা হচ্ছে পরম অমূলক আবিষ্কার। নাট্যাচার্য্য বলতে বুঝায় নাট্যশিক্ষাগুরু। যাঁরা দানীবাবুর বিদ্যাবুদ্ধির খবর রাখেন সেই সব ব্যক্তিই জানেন যে, দানীবাবু শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হ'লেও নাট্যশিক্ষা দেবার পক্ষে তাঁর উপযোগিতা ছিল অত্যন্ত অল্প। মনোমোহন থিয়েটারে তিনি যদি যথাযথ

ভাবে নাট্যাচার্য্যের কর্ত্তব্যপালন করতে পারতেন তাহ'লে ঐ রঙ্গালয়ের অমন শোচনীয় অধঃপতন হ'ত না। যিনি নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছেন, শিশিরকুমারের মত শিক্ষিত ব্যক্তি সব জেনে-শুনে তাঁকেই নিয়ে গিয়ে বসাবেন নিজের সম্পদায়ের নাট্যাচার্য্যের গদীর উপরে, এ হ'ল একেবারে অবিশ্বাস্য কথা। আসলে তিনি চেয়েছিলেন কেবল দানীবাবুর অপূর্ব্ব অভিনয়-শক্তিকেই ব্যবহার করতে। তাঁর সম্প্রদায়ে গেলে দানীবাবু হতেন একজন সম্মানভাজন প্রবীণ শিল্পী। হেমেন্দ্রবাবু আবার দানীবাবুর 'পরাজয়ে'র কথা তুলেছেন। হাস্যকর কথা। শিশিরকুমার কারুকেই পরাজিত করবার দুরভিসন্ধি নিয়ে নাট্যজগতে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন কেবল নাট্যকলার সাধনা করতে। তারপর দানীবাবুর মুখে যে যুক্তিহীন উক্তি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে যে তাঁর মস্তিষ্কে সহজ-বুদ্ধিরও অভাব ছিল। কে তাঁকে 'সিংহাসন' থেকে নামিয়েছিল? শিশিরকুমার না জনসাধারণ? শিশিরকুমার সত্যসত্যই তাঁকে যদি তথাকথিত 'সিংহাসন' থেকে নামিয়ে থাকেন, তবে দানীবাবুকে "আশাতিরিক্ত বেতন ও সম্মানের লোভ" দেখাতে যাবেন কেন? হেমেন্দ্রবাবু বহুকাল ধ'রে নাট্যকলা নিয়ে লেখনীচালনা করছেন, তাঁর একনিষ্ঠতা প্রশস্তিলাভের যোগ্য। কিন্তু এইরকম সব অর্থহীন, যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন কথা বলবার লোভ সংবরণ করতে না পারলে কোনদিনই তাঁর লেখনী জয়যুক্ত হ'তে পারবে না।

চৌদ্দ

"সীতা" পালার দৃশ্য-বিভাগের নূতনত্বের কথা নিয়ে প্রথমেই আলোচনা করা যাক। কিন্তু তারও আগে একটা ব'লে রাখা ভালো। পুরাতন নাটক "সীতা"কে এখনও মঞ্চস্থ করা হয় মাঝে, মাঝে। কিন্তু কেবলমাত্র শিশিরকুমারের অভিনয় ছাড়া তার মধ্যে বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য আর কিছুই থাকে না। তার দৃশ্যপট, তার সাজপোষাক ও তার নাচ-গান এখন একেবারেই বঞ্চিত হ'য়েছে পূর্ব্বগৌরব থেকে। আজকের "সীতা" আগেকার "সীতা"র কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আমরা যে সব বিশেষত্বের কথা বলব, কেউ যেন সেগুলিকে আজকের "সীতা"র মধ্যে অন্বেষণ করতে উদ্যত না হন, কারণ ব্যর্থ হবে সে অন্বেষণা।

বাংলাদেশে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই এখানকার সৌখীন নাট্যপ্রতিষ্ঠানগুলি মঞ্চের উপরে যে-শ্রেণীর দৃশ্যপট ব্যবহার বা দৃশ্য-সংস্থান করত, তার অনেক বর্ণনা আমরা সমসাময়িক আলোচনায় পাঠ করেছি এবং স্বচক্ষেও দেখেছি কিছু কিছু নমুনা।। সেইগুলিকেই আদর্শ ক'রে এখানে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হয় এবং "সীতা" খোলবার সময়েও আমাদের মঞ্চশিল্পীরা সে আদর্শ ভুলতে পারেন নি—অন্তত তার ঐতিহ্যকে। মঞ্চশিল্পীরা কোন নির্দ্দিষ্ট শিল্প-পদ্ধতি অনুসারে কাজ করতেন না। দৃশ্যসৌন্দর্য্য বলতে তাঁরা বুঝতেন অলঙ্কারবাহুল্য। তাঁদের পদ্ধতি তথাকথিত "rococo tradition"-এরই অনুসরণ করত।

পটুয়ারা স্বাভাবিক ঘর-বাড়ী, রাস্তা, গাছ-পালা ও নদী-পাহাড়

আঁকবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করতেন না, কিন্তু নট-নটীরা মঞ্চের উপরে পদার্পণ করলেই তাঁদের চেষ্টা যে কেবল ব্যর্থ হ'ত তা নয়; সময়ে সময়ে হাস্যকর হয়েও উঠত। আসল যে দেশ থেকে এসেছে আমাদের রঙ্গালয়ের আদর্শ, সেই য়ুরোপে সাধারণ বঙ্গ-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠারও অনেক আগে (১৮০৮ খৃঃ) নাট্য-পরিচালকদের দৃষ্টি এই-সব দিকে যে আকৃষ্ট হয়েছিল, জার্ম্মাণীর উইল্‌হেল্‌ম্ শ্লেগেলের বর্ণনা থেকে আমরা তা জানতে পারি। এখানে সে-সব কথা নিয়ে বিশেষ আলোচনার সুবিধা হবে না, কেবল কোন কোন ত্রুটির উল্লেখ করব মাত্র।

তখন যা কিছু দ্রষ্টব্য সমস্তই সমতল পৃষ্ঠপটের উপরে আঁকা হ'ত (এমন কি প্রায়ই ব্যবহার্য্য জিনিষপত্তর পর্য্যন্ত)। ফলে দাঁড়াত এই: মনে করুন পৃষ্ঠ-পটে আঁকা হয়েছে রাজপথের দৃশ্য। মাঝে রাস্তা, দুইধারে সার-বাঁধা ঘরবাড়ী। যতক্ষণ অভিনেতা নেই, ততক্ষণ ছবি হিসাবে দৃশ্যটি বেশ স্বাভাবিক। কিন্তু জীবন্ত অভিনেতা যেই মঞ্চে প্রবেশ করলেন, অমনি ব্যর্থ হয়ে গেল শিল্পীর সমস্ত পরিশ্রম ও পরিকল্পনা। ছবির বাড়ীঘর পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মানুসারে আঁকা, অভিনেতার মাথা উঠল দ্বিতল বা ত্রিতল বাড়ীর উপরে। আঁকা দরজাগুলো অভিনেতার কোমর ছাড়িয়ে উঠল না। তার ভিতর দিয়ে যে মানুষের আনাগোনা করা চলে না, এটা বেশ বোঝা যায়। অভিনেতা হাত তুললে আঁকা বাড়ীর ছাদে গিয়ে ঠেকে, পাদপ্রদীপের আলো অভিনেতার বৃহৎ ছায়াকে পটের আকাশের উপরে নিক্ষেপের করে—এমনি আরো কত কি।

"সীতা" খোলবার আগে আঁকা পটের ও জ্যান্তো নটের মধ্যে নিয়মিতভাবে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হয় নি বটে, তবে মাঝে মাঝে এক-একটি অঙ্কের শেষ-দৃশ্য স্বভাবানুগত করবার চেষ্টা হ'ত। সেগুলিকে

"সেট্ সিন" ব'লে ডাকা হয়। কিন্তু কোন একখানি নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যটি ঐ পদ্ধতি অনুসারে দেখাবার চেষ্টা হয়নি কোনকালেই। অর্থাৎ মাঝে মাঝে হঠাৎ বিদ্যুতের মত সজাগ হয়ে উঠত মঞ্চশিল্পীর মনোবৃত্তি, তারপরেই আবার হ'ত তা অন্ধকারে নিদ্রাগত। হয়তো মঞ্চশিল্পীরা এই-সব ত্রুটি সম্বন্ধে একেবারে অচেতন ছিলেন না। নাট্যকার নিজের খেয়ালেই নাটক রচনা করলেন, মঞ্চশিল্পের সুবিধা-অসুবিধা তিনি বোঝেন না। নাট্যাচার্য্যও নাটকখানিকে অভিনয়োপযোগী করবার জন্যে হয়তো গতানুগতিক প্রথায় ঢেলেই সাজলেন, সমসাময়িক যুগে পাশ্চাত্য নাট্যজগতে মঞ্চশিল্প কতখানি অগ্রসর হয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁরও কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। কাজেই বাঙালী মঞ্চশিল্পীদের অবস্থা হ'ত অত্যন্ত অসহায়. তাঁরা নাট্যশিক্ষকদের নির্দ্দেশ অনুসারে কেবল পটের পর পট এঁকেই খুসি থাকতেন। সকলের উপরে যদি আধুনিক নাট্যকলার সর্ব্ববিভাগের সঙ্গে পরিচিত একজন প্রয়োগকর্ত্তার অস্তিত্ব থাকত এবং তিনি যদি সমগ্র নাট্য-বস্তুর প্রত্যেক বিষয়টি একসূত্রে গেঁথে রচনা করতেন একগাছি অবিচ্ছিন্ন মাল্য, তা'হলে কারুকেই দেখতে হ'ত না কোনরকম বিসদৃশতাই।

গিরিশোত্তর যুগের অন্তত এমন একজন মঞ্চাধ্যক্ষের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, যাঁকে সত্যিকার শিল্পী ব'লে আজও শ্রদ্ধা করি। তিনি স্বর্গীয় অমর সিংহ রায়। তাঁর মন ছিল পরম আধুনিক এবং তাঁর পরিকল্পনা দেখে পরিতুষ্ট হয়েছিলেন শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথও। "মিসরকুমারী", "কিন্নরী" ও "কেলোর কীর্ত্তি" প্রভৃতি পালার জনপ্রিয়তার মূলে তাঁর পরিকল্পনার দাবি বড় অল্প নয়। তাঁকেও তখনকার অন্যান্য মঞ্চশিল্পীর মত যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যেই কাজ করতে হয়েছে, কারণ পরিচালকের নির্দ্দেশিত

নাটকীয় দৃশ্যসংস্থান প্রায়ই সাহায্য করত না তাঁর নিজের পরিকল্পনাকে। প্রয়োগকর্ত্তা রূপে শিশিরকুমারকে পেলে তিনি যে স্মরণীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে পারতেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের দুর্ভাগ্যক্রমে অত্যন্ত অল্প বয়সেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণ করতে হয়েছিল।

"সীতা"র প্রত্যেকটি বিভাগ ছিল প্রয়োগকর্ত্তা শিশিরকুমারের নখ-দর্পণে। আগেই বলা হয়েছে, সৌখীন সম্প্রদায় ত্যাগ করবার পর স্বাধীন ভাবে আত্মপ্রকাশ করবার সময়ে তিনি সর্ব্ববিভাগেই যে সব শিল্পীর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এসেছিলেন সাধারণ রঙ্গা-লয়ের বাইরে থেকে, তাই তাঁদের কেহই হননি গতানুগতিক। প্রত্যেকেই ছিলেন শিশিরকুমারের চিন্তাধারা ও পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত, তাই আপন আপন বিভাগে একই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ ক'রেও কেউ কোথাও করেন নি এতটুকু ছন্দঃপাত। চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্র যখন তুলি নিয়ে বসলেন, তখন সাধারণ মঞ্চ-শিল্পীর ঐতিহ্য তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাঁর মনোরথ ছুটে গেল সরাসরি আর্য্যভারতের চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের দিকে। এবং প্রয়োগকর্ত্তা শিশিরকুমার এমন সুকৌশলে করেছিলেন সমগ্র নাটকের দৃশ্য-সংস্থান, চারুচন্দ্রের পরিকল্পনা অনায়াসেই নাটকীয় ক্রিয়ার উপযোগী হয়েও নূতনত্ব সৃষ্টির জন্যে লাভ করলে সেই স্বাধীনতা, যার অভাবে যে কোন শিল্পীর কার্য্য হয়ে ওঠে বিড়ম্বনার নামান্তর।

পনেরো

দৃশ্যকে স্বাভাবিক করবার জন্যে রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে সর্ব্বপ্রথমে পাদপ্রদীপ তুলে দেওয়া হয় "সীতা" পালায়। খোলা জায়গায় স্বাভাবিক আলো আসে উপর থেকে এবং ঘরের ভিতরে তা আসে এপাশ থেকে, ওপাশ থেকে। স্বাভাবিক আলো কোন সময়েই মাটি থেকে উপর দিকে উঠে যায় না। সেই স্বভাববিরুদ্ধ কর্ত্তব্যপালনের জন্যেই রঙ্গমঞ্চে পাদ-প্রদীপের সৃষ্টি হয়েছিল। মঞ্চের উপরে চলন্ত মূর্ত্তি আবির্ভূত হ'লেই পাদপ্রদীপের আলো তার ছায়াকে নিক্ষেপ করত কখনো আকাশের উপরে, কখনো গগনভেদী পর্ব্বতচূড়ার উপরে এবং কখনো বা তিন-চার তলা উঁচু বাড়ীর ছাদের উপরে। ফলে চিত্রকর দর্শকের মনে স্বাভাবিকতার যে মায়া বা ভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাইতেন, তা ব্যর্থ হয়ে যেত একেবারেই। এদেশে এদিকে প্রথম চোখ পড়েছিল শিশির কুমারেরই। "সীতা"র সমস্ত দৃশ্যের উপরে আলো এসে পড়ত স্বাভাবিক ভাবেই আকাশ বা এপাশ-ওপাশ থেকে। সুতরাং রঙ্গমঞ্চের আলোক-শিল্পের মধ্যে যুগান্তর আনার প্রথম যে গৌরব, তাও শিশিরকুমারেরই প্রাপ্য।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত মঞ্চশিল্পী গর্ডন ক্রেগের মত হচ্ছে: মঞ্চের কোন দৃশ্যের মধ্যে কোথাও এমন দরজা বা পথ দেখানো উচিত নয়, যেখান দিয়ে সত্যিকার মানুষ আনাগোনা করতে অক্ষম হয়। "সীতা"র প্রত্যেক দৃশ্যেই এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছিল, তার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পালাই এমন গর্ব্ব করতে পারে না। 'উইং' বা পার্শ্বপট'ও ছিল আর একটি অস্বাভাবিক সেকেলে উপসর্গ; "সীতা" নাট্যাভিনয়ে তাও

পরিত্যক্ত হয়। আগে একই যুগের ও একই দেশের মঞ্চ-স্থাপত্য দেখাবার সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট 'ষ্টাইল' বা ভঙ্গি অনুসরণ করা হ'ত না, নানা দেশের নানা সময়ের নানা শ্রেণীর স্থাপত্য-ভঙ্গিকে একত্র ক'রে দেখানো হ'ত কি-এক পাঁচমিশেলি কিম্ভূতকিমাকার কাণ্ড। হিন্দু যুগের স্থাপত্যের সঙ্গে হয়তো মিশিয়ে দেওয়া হ'ত মোগল বা আধুনিক যুগের স্থাপত্য-ভঙ্গি। গিরিশচন্দ্র যখন 'মিনার্ভা'র কর্ণধার এবং স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল যখন মহলায় উপস্থিত থাকতেন, তখনই খোলা হয়েছিল "চন্দ্রগুপ্ত" পালাটি। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের যুগে কোন্ রীতি অনুসারে ঘর-বাড়ী তৈরি করা হ'ত (অধিকন্তু ভারতবাসীরা কি রকম সাজ-পোষাক পরত), সে সম্বন্ধে অধ্যক্ষের, নাট্যকারের, নাট্যাচার্য্যের বা মঞ্চশিল্পীর যে সামান্য জ্ঞান. বা ধারণাও ছিল, অভিনয় দেখে তা একেবারেই বোঝা যায়নি (এবং অদ্ভুত কথা এই, আজও বোঝা যায় না)। মৌর্য্য যুগে বহু গ্রীক পর্য্যটক ভারতভ্রমণে এসে স্বচক্ষে যা দেখেছিলেন তা লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। তা দুষ্প্রাপ্য নয়। ইতিহাসেও অল্পবিস্তর মালমশলার অভাব নেই। কিন্তু "চন্দ্রগুপ্ত" ও "অশোক" প্রভৃতি পালা খোলবার সময়ে সেকালকার (এবং একালকারও) থিয়েটারি পরিচালকরা ও-সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার মনে করেন নি। "সীতা"র স্থাপত্যে ও সাজসজ্জায় কোথাও দেখা যায় নি তথাকথিত বিসদৃশতা। সর্ব্বত্রই দেখেছি হিন্দু ভারতের প্রাচীন ও একই আদর্শানুসারী স্থাপত্য এবং সাজসজ্জা। একটিমাত্র নর্ত্তকী পর্য্যন্ত উদ্ভট পোষাক প'রে এসে দর্শকদের চোখ চম্‌কে দিয়ে ছন্দভঙ্গ করেনি।

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "সীতা"য় যে-সব ঘরবাড়ী দেখানো হয়েছিল ও নট-নটীকে যে সব পোষাক পরানো হয়েছিল, সত্য

সত্যই তার আদর্শ গৃহীত হয়েছে কি বাল্মীকির যুগ থেকেই? উত্তরে বলতে হবে, না। কারণ বাল্মীকির যুগ যে কোন্ যুগ, আজও ইতিহাস তা নিশ্চিতরূপে বলতে পারে না। কোন ঐতিহাসিক রামায়ণের কাল-নিরূপণ করেছেন বুদ্ধদেবের আগে, কেউ বা পরে। তবে অধিকাংশেরই মত হচ্ছে, বুদ্ধদেবের যুগে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ ঘর-বাড়ীই কাঠ দিয়ে তৈরি করা হ'ত। (এমন কি মৌর্য্য যুগের স্থাপত্যেও যে অল্পবিস্তর কাষ্ঠের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।) ঐতিহাসিকরা আরো বলেন, ভারতীয় স্থপতিরা পরে যখন ইট ও পাথর দিয়ে ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন, তখনও তাঁরা আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের দারুজ স্থাপত্যকেই। সুতরাং অজন্তা ও ইলোরা প্রভৃতি জায়গায় আমরা স্থাপত্যের যে সব নিদর্শন পাই, তার মধ্যেও যে রামায়ণী যুগের যথেষ্ট প্রভাব আছে, এটুকু অনুমান করা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। অতএব রঙ্গমঞ্চের উপরে পৌরাণিক যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সাজপোষাক ও আসবাবপত্র দেখাতে গেলে ভারতের প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তিগুলির সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আগেকার মঞ্চশিল্পীরা তা করতেন না, "সীতা"র মঞ্চশিল্পীই প্রথমে তা করেছেন এবং এইখানেই "সীতা"র সার্থকতা।

তারপর "সীতা"র শেষ-দৃশ্য। প্রথম প্রথম তা কি বিস্ময় ও উত্তেজনার সৃষ্টি করত! গিরিশ-যুগে রঙ্গমঞ্চের উপরে যে-সব জনতার দৃশ্য দেখানো হ'ত, তা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। নাট্যকার দেখাতে চান বিপুল জনতা, কিন্তু মঞ্চের উপরে দেখি মাত্র গুটিকয়েক লোক। উচিতমত পরিচালনার অভাবে তারাও অভিনয় করতে পারে না, দাঁড়িয়ে থাকে সাক্ষীগোপাল কাঠের পুতুলের মত। কাজেই দৃশ্যটা কেবল রসভঙ্গই করে না, হয়ে ওঠে দস্তুরমত হাস্যকর। আমাদের রঙ্গমঞ্চে "সীতা"

নাট্যাভিনয়ে শিশিরকুমারই সর্ব্বপ্রথমে দেখান সুনিয়ন্ত্রিত বৃহৎ জনতা। প্রাসাদ-অঙ্গনে উচ্চস্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, নিম্নস্থানে জনসাধারণ, সকলের উপরে অলিন্দে উপস্থিত অন্তঃপুরচারিণীরা। কেউ উপবিষ্ট, কেউ দণ্ডায়মান, কেউ চলমান এবং সকলেই করছে অভিনয়—কেউ ভাবে, কেউ ভাষায়। আগে এই শেষ-দৃশ্যে দেখা দিতেন অন্তত একশো জন নট-নটী, বাংলা রঙ্গালয়ে আর কখনো যা হয়েছে ব'লে শুনি নি। এই জনতা-নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও প্রকাশ পায় প্রয়োগকর্ত্তার অসাধারণ নৈপুণ্য।

ষোলো

অতি-আধুনিক যুগের বাংলা রঙ্গালয়ে সঙ্গীতের দুর্দশার সীমা নেই। কিন্তু গিরিশ ও গিরিশোত্তর যুগে সঙ্গীত ছিল নাট্যাভিনয়ের প্রধান একটি সম্পদ। যদিও সঙ্গীতের প্রতি নাট্যরসিকদের এই অতি-ভক্তি দেখে অনুষ্ঠাতারা একেবারে অস্থানেও সঙ্গীত সৃষ্টি করতে ছাড়তেন না এবং সময়ে সময়ে সঙ্গীতের উপদ্রবে নাটকীয় ক্রিয়া অধিকতর অগ্রসর না হয়ে স্তম্ভিত হয়ে যেত দস্তুরমত।

বাংলা রঙ্গালয়ের গানের সুরে ভঙ্গি পরিবর্ত্তন হয় তিন বার। আগেকার সুরশিল্পীরা গানের বাক্যার্থের দিকে দৃষ্টি দিতেন যত কম, প্রাচীন রাগ-রাগিণীর দিকে নজর রাখতেন তত বেশী। যদিও নাটকীয় কার্য্যসাধনের জন্যে তাঁরা 'থিয়েটারি সুর' নামে কথিত এক মিশ্রিত সুরের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবু তাঁরা সুর ও কথাকে সমান মর্য্যাদা দিতে রাজি ছিলেন ব'লে মনে হয় না। সেইজন্যে তখনকার মঞ্চ-সঙ্গীতে প্রায়ই গানের কথাগুলো কানের উপর দিয়ে ভেসে কোথায় হারিয়ে যেত, এবং কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করত কেবলমাত্র গানের সুর।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন একসঙ্গে নাট্যকার ও সুরশিল্পী। তিনি নিজেই গান বাঁধতেন এবং নিজেই সুর দিতেন—তাঁর আগে বাংলা দেশের আর কোন নাট্যকার এই সৌভাগ্য ও শক্তি অর্জন করতে পারেন নি। কবি, তাই কথার উপরে তাঁর দরদ থাকা স্বাভাবিক। সেইজন্যে তিনি সুরের কায়দা দেখাতে গিয়ে কথার মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে ফেলতেন না। এবং সেই কারণেই তাঁর গানগুলি শ্রোতাদের বিশেষভাবে

আকৃষ্ট ক'রে নাটককেও অধিকতর জনপ্রিয় ক'রে তুলত। কিন্তু তাঁরও অনেক গানে সুরের বাহুল্য ও কোন কোন চালের জন্যে কথাগুলো বেশ স্পষ্ট হয়ে আমাদের কানে এসে পৌঁছত না।

যখন "সীতা" পালা খোলা হয়নি, তখনই আমার সম্পাদিত "নাচঘর" পত্রিকায় আমি যা লিখেছিলুম ("গানের নূতন ধারা" প্রবন্ধে), তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার ক'রে দিলুম: "ঠুংরিতে প্রায়ই একটিমাত্র পংক্তির কথা সুরের সাহায্যে দীর্ঘকাল ধ'রে নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা হয়। কথা যেন কিছু নয়—তা সুর প্রকাশের অবলম্বনমাত্র। কিন্তু সত্যই কি তাই? গান বলতে যদি সুধু সুরের কসরতই বুঝায়, তবে কণ্ঠ-সঙ্গীতের দরকার কি? তাহ'লে কেবলমাত্র যন্ত্র-সঙ্গীতের দ্বারাই তো সে কর্ত্তব্য অধিকতর সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যেতে পারত এবং গান বাঁধবার জন্যে কবি বেচারীদের ধ'রে অকারণে টানা-হেঁচড়াও করতে হ'ত না। * * * পেশাদার গান-বাঁধিয়েরা বিশেষ রাগিণী ও তালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কথার পর কথা বসিয়ে যান - মালাকর যেমন একই সূতায় লাল, নীল, সবুজ, হলদে সব-রকম ফুলই গেঁথে ফেলে। রাগিণী ও তালের লীলা অব্যাহত থাকলেই গাইয়েরা খুসি হন, কথার ভাব মাঠে মারা গেলেও কারুর ভাগ্যে বাহবার অভাব ঘটে না। এদেশে রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে সঙ্গীতের দ্বারা এইভাবে কাব্যের আদ্যশ্রাদ্ধের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছেন। কেবল প্রতিবাদ ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, নিজে গান বেঁধে ও সুর দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, কথাকে অবহেলা না করলে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে গান কেমন উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সুরের সাহায্যে তিনি সুকৌশলে গানের কাব্যাংশকে জাগিয়ে তোলেন—বাঁধা গতের কোন মানা না মেনেই। * * * এমন অসংখ্য সুর আছে, যা পরস্পরের সঙ্গে অনায়াসে মিশ খায়। কিন্তু তবু যে তাদের কাছে

লাগানো হয় না তার কারণ হচ্ছে বাঁধা গতের মানা। রবীন্দ্রনাথ এ মানা মানেন না ব'লে ওস্তাদদের কাছে একেবারেই পাত্তা পান না। ওস্তাদদের মতে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের জাত মেরেছেন। * * * আমাদের থিয়েটারি গানও ওস্তাদদের মতে নিম্নশ্রেণীর। কারণ সর্ব্বসাধারণের উপভোগের জন্যে থিয়েটারি সুরেও রাগ-রাগিণী প্রায়ই অবিকৃত থাকে না। অথচ রঙ্গালয়ের গীত-শিক্ষকরা বাঁধা-গতের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েও গানের কাব্যাংশকে ফোটাবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত নন। * * * কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথে চললে থিয়েটারি গানও কতটা চমৎকার হয়ে ওঠে, কর্ণওয়ালিশ রঙ্গালয়ে অভিনীত "মুক্তার মুক্তি" নামক গীতিনাট্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আলফ্রেড রঙ্গালয়ের "বসন্তলীলা"র স্থানবিশেষেও গানের সুরে এই উপভোগ্য নূতনত্ব আছে। এজন্যে একমাত্র ধন্যবাদের পাত্র নবীন সঙ্গীতশিক্ষক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। এবিষয়ে অগ্রণী ব'লে বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তাঁর নাম স্থায়ী হবে।"

"মুক্তার মুক্তি"র পরমায়ু অনিবার্য্য কারণে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। "বসন্তলীলা" তো একটি একরত্তি পালা। কাজেই তাদের সঙ্গীতে বিশেষত্বের দিকে বেশী লোকের দৃষ্টি বা কর্ণ আকৃষ্ট হয়নি। গুরুদাসের পদ্ধতি অধিকতর যথার্থভাবে পরিচিত হয় "সীতা" পালাতেই। তিনি অবশ্য চাঁদের মতই নিজের ভিতর দিয়ে করলেন রবি-কিরণ বিকিরণ; কারণ, "সীতা"র বিখ্যাত "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে" ও "ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে" গান দুটি যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের "যেদিন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা" ও "আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও" গানের সুরকেই প্রায় অবিকলভাবে প্রকাশ করে। "মঞ্জুল মঞ্জরী" ও "রূপসায়রের দোদুল তালে" গান দুটিতেও রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি অনুসারেই সুর সংযোজিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সুরে

স্বরবর্ণের উচ্চারণকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর ক'রে তুলিয়ে দেওয়া হয় ব'লে গানের কথাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠবার অবকাশ পায়, মঞ্চ-সঙ্গীতের পক্ষে যার উপযোগিতা সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথের সুর সাধারণত কথাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজের বাহাদুরি ফলাবার চেষ্টা করে না, তাই সে বাধা দেয় না নাটকীয় ক্রিয়াকেও। রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতিই যে মঞ্চসঙ্গীতের পক্ষে সব-চেয়ে উপযোগী, "সীতা" পালাতে সেটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সঙ্গীত বিভাগে "সীতা" এনেছে আরো কোন কোন নূতনত্ব। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বর-সঙ্গতি ভারতীয় সঙ্গীতে সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার করেছিলেন গুরুদাসই ("শৃণ্বন্তু বিশ্ব" শ্লোকের সুরে)। বিভিন্ন দৃশ্যের বিশিষ্ট ভাবপ্রকাশের জন্যে "সীতা"র অভিনয়ের সময়ে বিশেষভাবে সহযোগিতা করত যন্ত্রসঙ্গীত। এখানেও শিশিরকুমার প্রয়োগনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পালাতেই আর কেউ অভিনয়ের রস ঘনীভূত করবার জন্যে এমন ভাবে যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণ করেন নি। তার উপরে "সীতা"য় কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠ-সঙ্গীত। তাঁর সঙ্গে তুলনীয় আর কোন সঙ্গীত-শিল্পী গত যুগের রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেছেন ব'লে জানি না।

সতেরো

এবারে "সীতা"র নাচের কথা। কিন্তু তার আগে বাংলা থিয়েটারি নাচ সম্বন্ধে মোটামুটি গুটিকয় কথা বলতে হবে। কারণ তা নইলে বোঝানো যাবে না যে "সীতা" নিয়ে এসেছিল নাচের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর নূতনত্ব।

গিরিশচন্দ্র নিজেই বলছেন: "যখন ন্যাশনাল থিয়েটার যোড়াসাঁকোর সান্যাল মহাশয়দের ভবনে স্থাপিত হয় (১৮৭১ খৃঃ), তখন রঙ্গালয়ে একরূপ নৃত্য ছিল না বলা যায়। কখন কোন প্রহসনে খেম্‌টা নাচের ঢংএ নৃত্য দেখাইবার প্রয়োজন হইত যথা—"একেই কি বলে সভ্যতা?" প্রহসনে সভার দৃশ্যে। পঞ্চরংয়েও হাস্যরসোদ্দীপক নৃত্যের প্রয়োজন হইত। নৃত্য কেহ শিখাইত না, যে যেরূপ জানে, নৃত্য করিত। তাহার নেতা হাস্যরসসিদ্ধ স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। যখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার সংস্থাপিত হয়, তখন "সতী কি কলঙ্কিনী?" তে হাবভাবের সহিত নৃত্যশিক্ষা রঙ্গালয়ে প্রথম প্রবেশ করে (১৮৭৪ খৃঃ) * * * কিন্তু দর্শকের দৃষ্টি পড়ে—নৃত্য এরূপ আনন্দপ্রদ হয় নাই।"

এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র আরো যা বলেছেন, সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই: অতুলচন্দ্র মিত্রের "আদর্শ সতী" গীতিনাট্যে (১৮৭৪ খৃঃ) সঙ্গীতবিদ রামতারণ সান্ন্যাল যে নাচ দেন, তা অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল। রামতারণ নিজেও বিভিন্ন পালায় নর্ত্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যথেষ্ট নাম কিনেছিলেন। "চৈতন্যলীলা" (১৮৮৪ খৃঃ) পালায় বৈষ্ণবী ঢঙের নৃত্য পরিকল্পনা করেন সঙ্গীতাচার্য্য বেণীমাধব অধিকারী। ষ্টার থিয়েটারে "নলিনাবিকাশ" (১৮৯০ খৃঃ) পালায় নৃত্যাচার্য্যরূপে প্রথম

আত্মপ্রকাশ করেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। তারপর এই বিভাগে খ্যাতি অর্জন করেন শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), তিনি কাশীনাথেরই শিষ্য। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে "ম্যাকবেথে"র ডাকিনীদের নাচ ও "আবুহোসেনে"র সমস্ত নৃত্য রাণুবাবুর পরিকল্পনার গুণে দর্শকদের বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেছিল। "এই সময় হইতেই রঙ্গালয়ে নৃত্য দর্শক আকর্ষণের একটি প্রধান অঙ্গ হয়।" রাণুবাবু মিনার্ভা পরিত্যাগ করবার পর তাঁর আসনে অধিষ্ঠিত হন শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়। "ফণীর মণি" ও "পাঁচ ক'নে" প্রভৃতি পালায় তাঁর দেওয়া নাচগুলি দর্শকদের চিত্তগ্রাহী হয়েছিল। তারপর "ক্লাসিকে"র (১৮৯৭ খৃঃ) আসরে সুপ্রসিদ্ধ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর আত্মপ্রকাশ। "আলিবাবা" পালায় নূতন ভঙ্গিতে নৃত্য পরিকল্পনার দ্বারা তিনি বাজার একেবারে মাৎ ক'রে দেন। ১৮৯৭ থেকে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমাদের থিয়েটারি নাচের উপরে ছিল নৃপেন্দ্রচন্দ্রেরই অল্পবিস্তর প্রাধান্য—যদিও বিভিন্ন রঙ্গালয়ে প্রাচীন কাশীনাথ এবং সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু) প্রভৃতি নৃত্যাচার্য্যরাও নূতন নূতন রসসৃষ্টি ক'রে প্রশংসাভাজন হ'তেন। "সীতা" খোলবার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত কড়িবাবু পুরাতন "মিনার্ভা" ও "ষ্টারে"র আসরে অনেক নূতন নাচ দিয়েছেন। তিনিই ছিলেন বাংলা রঙ্গালয়ের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃত্যাচার্য্য।

বৈঠকী গান ও বৈঠকী নাচ (অর্থাৎ যা 'ক্লাসিকালে'র পর্য্যায়ে পড়ে) এদেশে থিয়েটারের আগেও ছিল, এখনো আছে। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপরে যেখানে নাট্যাভিনয়ই হচ্ছে প্রধান, সেখানে ও-দুটির কোনটিই খাপ খায় না। বৈঠকী নাচ-গানের মধ্যেও যে 'অ্যাকসান' বা ক্রিয়া নেই, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু ওদের ক্রিয়ার সঙ্গে সাধারণ নাটকীয় ক্রিয়ার পার্থক্য আছে যথেষ্ট। সেইজন্যেই রঙ্গালয়ের সঙ্গীতাচার্য্য

ও নৃত্যাচার্য্যগণকে এমন বিশেষ এক চালের সুর ও নাচের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, ওস্তাদদের মতে যা অপাংক্তেয়। কিন্তু তাঁরা অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রেই খুসি, একটা মোটা কথা ভেবে দেখতেও নারাজ। নাচ গানের ডাকসাইটে ওস্তাদরা যদি কোনদিন সাধারণ নাট্যমঞ্চে নাটকের পাত্ররূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে নিজেদের ওস্তাদির অধিকাংশ ছাড়তে রাজি না হন, তাহ'লে তাঁদের অবস্থা হয়ে ওঠে কতখানি শোচনীয়, সেটা তাঁরা নিজেরাই পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন।

আমাদের রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের নাচের সঙ্গে আমার কোনই পরিচয় থাকবার কথা নয় এবং গিরিশচন্দ্রের মত হচ্ছে, তখনকার নাচও ছিল না উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন "মলিনাবিকাশ" ও "আবুহোসেন" পালা থেকেই "রঙ্গালয়ে নৃত্য দর্শক আকর্ষণের একটি প্রধান অঙ্গ হয়।" তখনও আমি নিতান্ত বাল্যজীবন যাপন করছি। কিন্তু পরে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ঐ দুটি পালাই একাধিকবার দেখবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, নৃত্যাচার্য্যদের সেই প্রাথমিক চেষ্টা তখনকার দর্শকদের যতই মুগ্ধ করুক, আমাকে তা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি। স্বর্গীয় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় তার বহুকাল পরে ("সীতা" খোলবার কিছু আগে) স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "মুক্তার মুক্তি" পালায় যে নাচগুলি দিয়েছিলেন, "মলিনাবিকাশে"র নাচ সেগুলির কাছে দাঁড়াতেও পারে না। এবং রাণুবাবুও কোহিনূর থিয়েটারের বিভিন্ন পালায় যে-সব নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁর "আবুহোসেনে"র নৃত্য-পরিকল্পনা সে-গুলির কাছে পরিম্লান হয়ে যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই একই নৃত্যাচার্য্যের কাজের মধ্যে এমন পার্থক্য থাকার কারণ হচ্ছে, শিল্পীর নবীনতা ও প্রবীণতা।

আঠারো

কাশীনাথ, রাণুবাবু ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতির সমসাময়িক নৃত্যশিল্পীরা যে-সব গভীর ভাবের নাচ পরিকল্পনা করতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মধ্যে থাকত না উচ্চশ্রেণীর সূক্ষ্মতা, ভঙ্গি-বৈচিত্র্য ও কাব্যমাধুর্য্য। নর্ত্তকীরা সাধারণত তবলার সঙ্গে নূপুরের বোল মেলাতে পারলেই কর্ত্তব্য প্রায় শেষ হয়ে গেল ব'লে মনে করত। তাদের দেহ ছিল না নমনীয়, বেশীর ভাগ সময়েই তারা সটান খাড়া হয়ে থাকত, এপাশে ওপাশে বা সামনের দিকে নত হ'ত সোজাসুজিই। নাচের সময়ে যে দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেই নিযুক্ত রাখতে হয়, এ শিক্ষা থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। পরিকল্পিত নৃত্যগুলির মধ্যে নূপুরের বোল ছাড়া ভারতীয় নৃত্যের অধিকাংশ বিশেষত্বই পাওয়া যেত না। কেবল এক শ্রেণীর নৃত্যেই তারা অল্পবিস্তর সফলতা অর্জন করত এবং তা হচ্ছে চটুল ও হাস্যরসপ্রধান নাচ। "সাজাহান", "চন্দ্রগুপ্ত", "আলমগীর" ও "আলিবাবা" প্রভৃতি পুরাতন পালাগুলির পুনরভিনয়ের সময়ে সকলে এখনো আমাদের সেকেলে থিয়েটারি নাচের ঐসব দোষগুণ লক্ষ্য করতে পারবেন।

আজ এদেশে উদয়শঙ্কর প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্য থেকে নৃত্যভঙ্গি গ্রহণ ক'রে অনুপম রূপসৃষ্টি করছেন বটে, কিন্তু ত্রিশ বছরের আগেও (১৩৩১ সালের ২৬শে বৈশাখ তারিখের "নাচঘর" পত্রিকায়) এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলুম সর্ব্বপ্রথমে আমিই। আমার উক্তির কিয়দংশ এই: "আমাদের হাতের কাছে কেবলমাত্র উৎকলের মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলি দেখলেই যে কত রকমের চমৎকার নাচের ভঙ্গি পাওয়া যায় তা আর বলবার নয়। যদি কোন

নৃত্যশিক্ষক রঙ্গালয়ে সেই-সব ভঙ্গি কাজে লাগাতে পারেন, তবে দু'দিনেই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠবেন। আমাদের রঙ্গালয়ের নৃত্যশিক্ষকদের শিক্ষাই এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। রঙ্গালয়ের কার্য্য গ্রহণ করার আগে তাঁদের উচিত, ভারতের নানা প্রদেশে গিয়ে নানা ভঙ্গির নৃত্য-পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করা। প্রাচীন মন্দিরাদির ভাস্কর্য্য থেকেও সাহায্য গ্রহণ না করলে চলবে না।"

বাংলাদেশে রঙ্গালয়ের বাইরে তখন কোন শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষ বা মহিলা পায়ে নাচের নূপুর পরবার কল্পনাও করেন নি। রঙ্গালয়ের নৃত্য-শিক্ষকদেরও মনে আমার প্রস্তাব কোন রেখাপাতই করলে না। তাই ভেবেছিলুম আমার প্রস্তাব ছাপার অক্ষরেই বন্দী হয়ে থাকবে, কোন-দিনই কার্য্যে পরিণত হবে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরেই শিশিরকুমার "সীতা" খোলবার আয়োজন ক'রে স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গো-পাধ্যায় ও আমার উপরে নৃত্য-পরিকল্পনার ভার দান করলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব কতটা কার্য্যকর হয়, তা পরীক্ষা করবার দুর্লভ সুযোগ পেলুম। সম্প্রদায়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর মত উচ্চবেতনভোগী অদ্বিতীয় নৃত্যগুরু বর্ত্তমান থাকতেও শিশিরকুমার ছাড়া অন্য কেউ এমন সুযোগ আর কারুকে দিতেন না।

ভুবনেশ্বরের রাজারাণী মন্দিরের গায়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান একটি নারীমূর্ত্তি আছে। কণারক মন্দিরের গায়েও এমন একাধিক নারীমূর্ত্তি খোদিত আছে, উপবিষ্ট অবস্থাতেও যেগুলির কোমর, বুক, গ্রীবা, মাথা ও বাহুর ভঙ্গি প্রায় প্রথমোক্ত মূর্ত্তিরই মত। বেশ বোঝা যায়, ঐ ভঙ্গিমাটি উৎকল-শিল্পীদের কাছে ছিল অত্যন্ত প্রিয়। "মঞ্জুল মঞ্জুরী নব সাজে" গানটির সঙ্গে যে নাচটি আছে, তার মধ্যে প্রধান হয়ে রইল ঐ ভঙ্গিমাটিই। গায়ক যেমন বারবার গানের প্রথম পংক্তিতে ফিরে আসেন, নর্ত্তকীরাও তেমনি বারবার ঐ ভঙ্গিমাটি গ্রহণ করবেন, এই স্থির

করা হ'ল। তারপর পরিকল্পনার মধ্যে গৃহীত হ'ল আরো সব ভঙ্গি ও পুরতান মুদ্রা প্রভৃতি।

কিন্তু মহলায় ঐ-সব ভঙ্গি অভ্যাস করাতে গিয়ে নর্ত্তকীদের নিয়ে বিপদে পড়া গেল। আড়ষ্ট ভাবে নাচতে শিখে তাদের দেহ এমন অনমনীয় হয়ে পড়েছিল যে, ভারতীয় ভাস্কর্য্যে খোদিত মূর্ত্তির ত্রিভঙ্গ বা অন্যান্য অঙ্গভঙ্গ কিছুতেই তারা গ্রহণ করতে পারলে না। তখন চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্রের দ্বারা রাজারাণী মন্দিরের মূর্ত্তিটির প্রকাণ্ড একখানা পট আঁকিয়ে মঞ্চের মাঝখানে স্থাপন করা হ'ল এবং নর্ত্তকীরা আগে বেশ কিছুদিন ধ'রে পটের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের হাত, পা, কোমর, বুক ও গ্রীবা চিত্রলিখিত মূর্ত্তির উপযোগী ক'রে তোলবার জন্যে অভ্যাস করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তাদের দেহ কতকটা তৈরি হয়ে উঠল এবং নৃত্য-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করতে আমাদের আর বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। "সীতা"য় আর একটি নাচ ছিল "রূপসায়রের দোদুল তালে" গানটির সঙ্গে। সে নাচটির পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে মণিলালেরই। তার মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্য্য থেকে নৃত্যভঙ্গি গৃহীত হয়নি বটে, কিন্তু তারও পরিকল্পনা হয়েছিল অভিনব এবং আধুনিক যুগের উপযোগী; উপরন্তু তারও কোথাও ছিল না আমাদের থিয়েটারি নাচের ছাপ। "সীতা"র আজকালকার পুনরভিনয়ে প্রথমোক্ত নাচটির পূর্ব্বরূপের একআনাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ এবং শেষোক্ত নাচটি একেবারেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

আজ আর একথা বিশেষ ক'রে বলা বাহুল্য যে, নাচের দিক দিয়েও "সীতা" রীতিমত উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। নাচ দেখে স্বর্গীয় পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সবিস্ময়ে কাগজে মত প্রকাশ করেছিলেন: "নৃত্য দর্শনের সময়ে ভাবিতেছিলাম, কি করিয়া সেই প্রাচীন যুগের

কপোতহস্তিকা, দ্বিপাদিকা প্রভৃতি ভারতনাট্য সূত্রের নৃত্যাদি সমূহ ইহারা অভ্যাস করাইলেন।" একে একে "সীতা"র অধিকাংশ নব-যুগোপযোগী বিশেষত্বের কথা বলা হ'ল, অতঃপর বলব তার মহলায় শিশিরকুমারের কৃতিত্বের কথা।

উনিশ

মহলার মত মহলা আর দেখি না। বরং একাধিকবার দেখেছি প্রায় বিনা মহলাতেই এক-একখানি নূতন নাটক অভিনীত হ'তে। তার উপরে আজকাল এই যে নিয়মিতভাবে পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন হয় এবং তাতে যোগদান করেন বিভিন্ন রঙ্গালয়ের খ্যাতনামা শিল্পীরা, তা দর্শন ক'রে জনসাধারণ যে কী আনন্দ লাভ করেন আমার কাছে তার হদিস নেই। কারণ অধিকাংশ সময়েই সেই সম্মিলিত অভিনয়ের জন্যে কোন মহলারই ব্যবস্থা হয় না, কিংবা যেটুকু ব্যবস্থা হয় তা উল্লেখযোগ্যই নয়। ফলে শিল্পীদের নামের ডাকে গগন ফাটলে কি হবে, তাঁরা কাজ দেন তথাকথিত পিতলের কাটারির মত—অর্থাৎ "পিতলক কটারী কামে নাহি আবল, উপরকী ঝকমক সার।" বাংলাতেও একটি অনুরূপ প্রবাদ আছে—"পিতল সরা জাঁকে ভরা", অর্থাৎ কাজ কম, আড়ম্বর যথেষ্ট।

যাক্, যা বলছিলুম বলি। ঐ সব পুনরভিনয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হবার আগে শিল্পীরা মহলা দিয়ে পরস্পরের উপযোগী হয়ে ওঠেন না ব'লে রসভঙ্গ হয় পদে পদে। কেউ কারুর মুখ তাকান না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাপদানি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত এবং এর মধ্যে প'ড়ে সব চেয়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে ওঠে ক্ষুদ্রতর ভূমিকার গ্রাহকরা। বার কয়েক এমনি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ দেখে আমি আর পারতপক্ষে এদেশের সম্মিলিত আসরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করি না। শিশিরকুমার একদিন আমাকে বলেছিলেন, "নাম-করা শিল্পীরা কি ক'রে যে বিনা মহলায় সম্মিলিত অভিনয় করতে রাজি হন, আমি ত ধারণাতেই আনতে পারি না। এ ভাবে অভিনয় করবার ক্ষমতা আমার তো নেই।" তিনি অক্ষম, কারণ মহলার প্রতি

তাঁর মতন অচলা নিষ্ঠা বাংলার বর্ত্তমান নাট্যজগতে আর কোন শিল্পীর আছে ব'লে জানি না। আমাদের অধিকাংশ নামজাদা শিল্পীই আর্টকে পেশায় পরিণত করেছেন কলা-লক্ষ্মীর মুখ তাকিয়ে নয়, মুদ্রার উপরে খোদিত রাজার মুখ তাকিয়েই। চুলোয় যাক্ ললিতকলা, বেঁচে থাক্ কাঞ্চন-মুদ্রার সঙ্গীত।

নূতন নূতন শিল্পী তৈয়ারি হয় কেবলমাত্র মহলার গুণেই। আজকাল তা আর হয় না ব'লেই আমাদের নাট্যজগৎ নূতন শিল্পীর অভাবে ক্রমেই দরিদ্র হয়ে পড়ছে। শুনেছি সেকালকার গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল প্রভৃতির উচ্চশ্রেণীর মহলা দেবার শক্তি ছিল। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর কি ভাবে মহলা দিতেন তা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে পুঁথিপত্রে কিছু কিছু পড়েছি বটে। গত যুগের সুপরিচিত অভিনেতা স্বর্গীয় হীরালাল দত্ত "নাচঘরে" লিখেছিলেন: ষ্টার থিয়েটারে "মহলা দিবার সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, অমৃতলাল বসু মহাশয়, অমৃতলাল মিত্র মহাশয় প্রমুখ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরাও সকলেই উপস্থিত থাকতেন। *** নটগুরু গিরিশচন্দ্রই মহলা দেওয়াতেন এবং প্রায়শঃ তাঁহার শিষ্য, সহকর্ম্মী এবং বন্ধু অমৃতবাবুদ্বয়ের যে কেহ উপস্থিত থাকতেন, তাঁকেই 'ওহে অমত্ত, বল বল' ব'লে স্বয়ং নিবৃত্ত হ'তেন। শুধু যে নির্ব্বাচিত নাটকখানিরই মহলা হ'ত তা নয়, সেই সঙ্গে নাট্যোল্লিখিত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক উক্তির বিশদ আলোচনা ও ব্যাখ্যা হ'ত। এমন কি রঙ্গালয়ের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির দ্বারা সাধনীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও হ'ত।" প্রভৃতি। স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থেও গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর মহলা দেবার পদ্ধতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা আছে।

অমৃতলাল বসুর মহলা আমি দেখি প্রায় পঁইত্রিশ বৎসর আগে।

পুরাতন মিনার্ভা থিয়েটারে আমার একখানি নাটিকা অভিনীত হয়। অমৃতলাল যদিও তখন মিনার্ভার দলে ছিলেন না, তবু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন ঐ নাটিকাখানির মহলা দেবার ভার। তারপর তাঁর শেষ নাটক "যাজ্ঞসেনী"র মহলাতেও নাট্যাচার্য্য ছিলেন তিনি নিজেই। সে সময়েও প্রায় প্রতি রাত্রেই মহলার সময়ে আমি তাঁর পাশে উপস্থিত থাকতুম। তিনি নিজে ছিলেন রসিক পুরুষ, মহলাতেও নিযুক্ত থাকতেন রসালাপ করতে করতে। যে যেমন দরের শিল্পী তাকে সেইভাবেই শেখাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কারুকে নিয়ে সমান ভাবে শেষ পর্য্যন্ত লেগে থাকতে তাঁকে দেখিনি, যে গুণ নাকি গিরিশচন্দ্রেরও ছিল না। আগেকার দিনে এই গুণ ছিল অর্দ্ধেন্দুশেখরের এবং আজকের দিনে এ গুণ আছে শিশিরকুমারের।

সেকালে হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও নাট্যশিক্ষক ব'লে খ্যাতি ছিল। গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই তিনি নাট্যাচার্য্যরূপে তাঁর নাটককে অভিনয়ের উপযোগী ক'রে তুলেছেন এবং কোন কোন নাটকের মহলায় তিনি ছিলেন গিরিশচন্দ্রের সহযোগী। কিন্তু তাঁরও শিক্ষাদানপদ্ধতি দেখবার সুযোগ আমার ঘটেনি। গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর আরো দুইজন অভিনেতা শিক্ষক রূপে অল্পবিস্তর খ্যাতিলাভ করেছিলেন—চূণীলাল দেব এবং অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অনেকবার তাঁদের মহলা দেখেছি। কিন্তু তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল সেকেলে এবং শেখাতে শেখাতে তাঁরা দুজনেই মাঝে মাঝে ধৈর্য্যচ্যুত ও ক্রুদ্ধ হ'তেন—শিক্ষকের পক্ষে যা সুখ্যাতির কথা নয়।

নবযুগের অভিনেতাদের মধ্যে শিক্ষক রূপে শিশিরকুমারের পরেই যাঁর নাম করতে পারি, তিনি হচ্ছেন স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। নতুন অভিনেতা তৈরি করবার শক্তি ছিল তাঁর যথেষ্ট। নরেশচন্দ্র

মিত্রও নাট্যাচার্য্য রূপে নাম কিনেছেন। নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীরও নাট্যশিক্ষাদানের শক্তি ছিল, কিন্তু সে শক্তি সাধারণত অলস হয়ে থাকত খাপে বদ্ধ তরবারির মত। অহীন্দ্র চৌধুরী শিক্ষকতা কার্য্যে স্মরণীয় কিছু করতে পারেননি।

গিরিশোত্তর যুগে নাট্যাচার্য্যরূপে প্রথম শ্রেণীর প্রথম বলতে বুঝায় একমাত্র শিশিরকুমারকেই। নাট্যাচার্য্যের আসন অলঙ্কৃত করতে হ'লে একাধারে যতগুলি গুণ থাকার প্রয়োজন হয়, তাঁর মধ্যে দেখি তার অধিকাংশই। হয়তো গিরিশ-যুগেও তিনি অতুলনীয় হ'তে পারতেন। কারণ গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর মহলা দেখিনি বটে, কিন্তু তাঁদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বিশেষভাবে প্রস্তুত বিখ্যাত সব নাট্যাভিনয়ের মধ্যে যে সকল প্রয়োগদোষ দেখেছি, আগেই দৃষ্টান্ত দিয়ে তার কতক কতক উল্লেখ করেছি এবং দরকার হ'লে আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

বিশ

আলোকিত, সুসজ্জিত, সুচিত্রিত নাট্যশালা, বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন সাজপোষাকে শিশিরকুমার করেন রঙ্গাবতরণ; তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি, অঙ্গভঙ্গ ও গতিবিধি পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহকে ক'রে তোলে প্রশস্তি-গানে মুখরিত। নাট্যপ্রিয় জনসাধারণ বাহিরে ব'সে শিশিরকুমারের কাছ থেকে এইটুকু দান পেয়েই খুসি হয়ে বিদায়গ্রহণ করে।

কিন্তু শিশিরকুমারের দান করবার শক্তি যে আরো কত বেশী, সে পরিচয় পেয়েছেন কেবল তাঁর শিষ্য, সহকর্ম্মী ও ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গগণ। মহলার সময়ে মঞ্চের উপরে বাইরের জাঁকজমক কিছুই থাকে না—না অত্যুজ্জ্বল আলোকমালা, না বর্ণবিচিত্র দৃশ্যপট ও পোষাক-পরিচ্ছদ, না অবিচ্ছিন্ন ও ক্রমবর্দ্ধমান নাটকীয় ক্রিয়া, কিন্তু তবু শিশিরকুমার যখন একাই একাধিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন পুরুষ ও নারী ভূমিকায় অভিনেয় যা-কিছু তা বুঝিয়ে দিতে আরম্ভ করেন, তখন বার বার আমার মনে হয়—কোন্ শিশিরকুমার বড়? প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের বিশেষ ভূমিকার অভিনেতা শিশিরকুমার, না অপ্রকাশ্য মহলায় একাধারে বহু ভূমিকার নাট্যশিক্ষাদাতা শিশিরকুমার? রঙ্গমঞ্চের উপরে তাঁকে দেখি কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা রূপে, কিন্তু মহলার আসরে তাঁকে দেখতে পাই উচ্চতর ও মহত্তর এক বিপুল ও বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী কলাবিদ রূপে। সেখানে তিনি ছবি না এঁকেও ছবিকার, নাট্যকার না হয়েও নাট্যরসস্রষ্টা, সুরকার না হয়েও সঙ্গীতজ্ঞ এবং নৃত্যপরায়ণ না হয়েও নৃত্যকলাবিদ্; সেখানে তিনিই নট, তিনিই নটী এবং তিনিই মূক কাটা-সৈনিক; সেখানে তিনি ভাবুক,

কাব্যরসিক, ঐতিহাসিক ও সমালোচক; সেখানে তিনি স্রষ্টা, শ্রোতা ও দ্রষ্টা। "সীতা" পালার কথাই ধরুন। তিনি স্বয়ং নাটক বা গান রচনাও করেন নি, গানের সুরও দেন নি, নাচও শেখাননি, বা দৃশ্যপটও আঁকেন নি। কিন্তু উপরোক্ত প্রত্যেক বিভাগেই সকলের উপরে কাজ করেছে একমাত্র তাঁরই মস্তিষ্ক। ঐ সব বিভাগের কর্মকর্তাদের উপরে তিনি যে পদে পদে হুকুমজারি করেছেন, তাও নয়; অধিকাংশ স্থলেই তাঁকে মৌখিক উপদেশ দিতেই হয় নি, প্রত্যেককেই তিনি প্রায় স্বাধীন ভাবেই কাজ করবার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বেছে বেছে এমন সব সহকর্মী নির্ব্বাচন করেছিলেন, যাঁরা তাঁর ধ্যান-ধারণা ও পরিকল্পনার সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিত।

নিজের সম্প্রদায় গড়বার পর তথাকথিত নামজাদা অভিনেতাদের দলভুক্ত করবার জন্যে তিনি কোনই আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। আজ পর্য্যন্ত কচি ও কাঁচাদের উপরেই তাঁর আস্থা বেশী। সাধারণ রঙ্গালয়ে অজ্ঞাতনামা যে সব তরুণকে তিনি নিজের পতাকার তলায় ডেকে এনে চলতে-বলতে শিখিয়ে তৈরি ক'রে তুলে অকুতোভয়ে "সীতা"কে মঞ্চস্থ করেছিলেন, অনতিকালের মধ্যেই তাঁরা প্রাধান্য-বিস্তার করতে পেরেছিলেন বাংলার সমগ্র নাট্যজগতে। শিষ্যের পর শিষ্য মানুষ হয়ে প্রস্থান করেছেন স্থানান্তরে; কিন্তু তবু তিনি হতোদ্যম হন নি; সমান আগ্রহে ও উৎসাহে শিক্ষা দিয়ে আবার তৈরি করেছেন নূতন নূতন শিষ্যের পর শিষ্য। আজ বাংলাদেশের প্রত্যেক রঙ্গালয়ে দৃষ্টিপাত করলে শিশিরকুমারের শিষ্য বা প্রশিষ্যকে আবিষ্কার করতে বিলম্ব হবে না।

মহলায় শিষ্য গঠন করবার এই অতুলনীয় শক্তি দেখে বহু বিখ্যাত ব্যক্তিই সবিস্ময়ে ও মুক্তকণ্ঠে শিশিরকুমারের প্রশংসা না ক'রে পারেন

নি। স্বর্গীয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "সীতা" দেখে লিখেছিলেন: "বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ইহার তুলনা নাই। আশ্চর্য্য, এই স্বল্পকালের মধ্যেই শিশির কি করিয়া না তাঁহার দলের নূতন লোকগুলিকে এমন মানুষ করিয়া তুলিলেন!" শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "কি অভিনয় করার দক্ষতা, কি অভিনয় শিক্ষা দেবার ক্ষমতা দুই দিক দিয়ে শিশিরবাবুর পরিচয় নেবার সৌভাগ্য হয়ে গেল আমার সেদিন, এবং এটার জন্যও তাঁকেই আমার ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে।" স্বর্গীয় অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ লিখেছিলেন: "নবীন পাত্রগণের দ্বারা অতি প্রাচীন ভাব এত সুন্দর করিয়া করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শিশিরকুমারকে শত শত ধন্যবাদ।" স্বর্গীয় সাহিত্যসেবক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন; "সীতা দেখতে দেখতে এই কথাটাই আমাদের বার বার মনে হয়েছে যে শিশিরকুমারের অভিনয় করবার ক্ষমতা বেশী, না অভিনেতা তৈরি করবার ক্ষমতা বেশী? এঁর সম্প্রদায়ে দেশবিখ্যাত প্রকাণ্ড নামজাদা অভিনেতা নেই বললেই চলে, সবাই প্রায় কাঁচা, কচি, অনভিজ্ঞ; কিন্তু হঠাৎ এঁদের অনেকের অভিনয়-নৈপুণ্যের যে পরিচয় পেলুম তা আমাদের মতে বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিরল।"

শুনেছি, নাট্যশিক্ষা দেবার সময়ে গিরিশচন্দ্র নট-নটীদের নিয়ে নিযুক্ত থাকতে চাইতেন না। প্রধান প্রধান কয়েকজনের ভার নিজেই গ্রহণ করতেন, কিন্তু অধিকাংশকে তৈরি ক'রে তোলবার ভার নিতেন অর্দ্ধেন্দুশেখর। কিন্তু এমন সহযোগী লাভের সৌভাগ্য হয়নি শিশির-কুমারের। ছোট-বড় প্রত্যেক ভূমিকাগ্রাহককে নিয়ে একা তাঁকেই সমানভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, প্রত্যেককে পাখী-পড়ানোর মত ক'রে বার বার ভূমিকার কথা ও ক্রিয়া অভ্যাস করাতে হয়েছে এবং সেই

সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের অন্য সমস্ত বিভাগের প্রত্যেক খুটিনাটিটি পর্য্যন্ত নখদর্পণে রাখতে হয়েছে (গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুও যা রাখতেন না)। সকলকে ও সমস্ত-কিছু নিয়ে তাঁকে একা ব্যাপৃত থাকতে হয় ব'লে প্রায়ই দেখা গেছে যে নাটক মঞ্চস্থ হবার সময়ে সম্প্রদায়ের আর সবাই প্রস্তুত, কিন্তু শিশিরকুমার স্বয়ং রীতিমত অপ্রস্তুত, কারণ নিজের ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর তিনি পান নি। কিন্তু শিষ্যদের নিয়ে তিনি এত চেষ্টা ও পরিশ্রম করলেও আজ পর্য্যন্ত শিশিরকুমারের এমন শিষ্য আমি দেখিনি বললেও চলে, সমগ্র ভাবে যিনি গ্রহণ করতে পেরেছেন গুরুদত্ত শিক্ষাকে। তবু তাঁর শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ না ক'রেও শিষ্যরা বরাবরই পেয়ে এসেছেন জনসাধারণের প্রশংসাঞ্জলি।

একুশ

পুরাতন বিখ্যাত নাটকাবলীর পুনরভিনয়কে স্মরণীয় ক'রে তোলবার জন্যে বরাবরই শিশিরকুমারের একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছে। তাঁর এই আগ্রহের কারণ নয় অর্থলোভ। তিনি চেয়েছেন পুরাতনের উপরে নতুনের আলোকপাত করতে, মৃত নাটকগুলিকে নূতন রূপে, রসে ও জীবনে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে। যে সব পুরাতন নাটকের উপরে তিনি হস্তার্পণ করেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, চন্দ্রগুপ্ত, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, ভীষ্ম, সাজাহান, রঘুবীর, জনা, সধবার একাদশী, বিসর্জ্জন ও সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্তে"র মধ্যে আছে একাধিক নাটকের উপাদান। নাট্যকারের পক্ষে এটা প্রশংসার কথা নয়। "চন্দ্রগুপ্তে"র এই দুর্ব্বলতা সর্ব্বপ্রথমে ধ'রে ফেলেছিলেন শিশিরকুমারই।

"সীতা" নাট্যাভিনয়ে শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুসি হয়ে সর্ব্বপ্রথমে তাঁর উপরেই "চিরকুমার সভা" অভিনয় করবার ভার দেন। "চিরকুমার সভা" প্রথমে একটি ধারাবাহিক নাটকীয় কাহিনী রূপে "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও যে তার উপযোগিতা আছে, শিশিরকুমারের আগে বাংলা রঙ্গালয়ের আর কোন ব্যক্তি এ সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারেননি। তাঁর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে কাহিনীটিকে রঙ্গালয়ের উপযোগী ক'রে দিলেন। "চিরকুমার সভা"র অভিনয়ের আয়োজন হ'তে লাগল। কিন্তু মুস্কিল হ'ল অক্ষয়ের ভূমিকাটিকে নিয়ে। ঐ ভূমিকার গ্রাহককে একসঙ্গে হ'তে হবে ভালো গায়ক ও ভালো অভিনেতা। কিন্তু সে-রকম গুণী শিল্পী মনোমোহন নাট্যমন্দিরে ছিলেন না। ঐ শ্রেণীর একজন সৌখীন

শিল্পীর সন্ধান পাওয়া গেল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে। তিনি একদিন রঙ্গালয়ে এলেনও বটে, কিন্তু তারপরই অদৃশ্য হ'লেন। কারণ নাকি অভিভাবকদের অসম্মতি। ফলে "চিরকুমার সভা" কয়েক মাসের মধ্যে পাদপ্রদীপের আলোকে আত্মপ্রকাশ করতে পারলে না এবং এই বিলম্বের সুযোগ গ্রহণ করলেন আর্ট সম্প্রদায়ের সেই সুচতুর কর্ত্তৃপক্ষ, এর আগেই যাঁরা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" হরণ। "চিরকুমার সভা"ও শিশিরকুমারের হাতছাড়া হয়ে গেল। তবে ঐ পালাটির সঙ্গেও তাঁর স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে। কারণ কয়েক বৎসর পরে ঐ আর্ট থিয়েটারেই তিনি চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অপূর্ব্ব অভিনয়নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন। "চিরকুমার সভা"র পাণ্ডুলিপি শিশিরকুমারের হাতে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, পৌরাণিক চরিত্র অর্জ্জুনকে নিয়ে তিনি তাঁর জন্যে একখানি নূতন নাটক রচনা করবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়নি।

অভিনয়োপযোগী নাটকের জন্যে চিরদিনই শিশিরকুমারের মন ঘোরে নূতন নূতন অজানা পথে। প্রতিভা বাঁধা রাস্তা ভালোবাসে না। তাঁর এই মনের গতির জন্যেই বিস্মৃতির রাজ্য থেকে "রঘুবীরে"র পুনরাগমন, দ্বিজেন্দ্রলালের অনভিনীত নাটকের উপরে হাত দিলেই যে-প্রতিপক্ষের দল হঠাৎ অত্যন্ত সজাগ হয়ে তাঁকে বঞ্চিত করবার সুযোগ খোঁজেন, তাঁদের অতিশয় বিস্মিত ও হতাশ ক'রে শিশিরকুমার আবার খুঁজে বার করলেন দ্বিজেন্দ্রলালেরই এমন একখানি নাটক, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপরে আগে যাকে আর কখনও দেখা যায় নি! পালাটির নাম "পাষাণী"। দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত তাকে সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করতে ভরসা পাননি। ব'লে রাখা দরকার, যোগেশচন্দ্রের "সীতা"র পর "পাষাণী"ই হচ্ছে মনোমোহন নাট্যমন্দিরের দ্বিতীয় নাটক।

"পাষাণী"র মহলা চলতে লাগল। প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন শিশিরকুমার (গৌতম ও ইন্দ্র), স্বর্গীয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (চিরঞ্জীব), স্বর্গীয় অমিতাভ বসু (বিশ্বামিত্র), স্বর্গীয় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (শতানন্দ), স্বর্গীয় জীবনকুমার গাঙ্গুলী (মদন), শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় (রাম), স্বর্গীয়া প্রভা (অহল্যা), শ্রীমতী উষা (রতি), শ্রীমতী মনোরমা (মাধুরী)। সঙ্গীত-বিভাগের ভার পেলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। নাটকের ইন্দ্রসভা দৃশ্যের নৃত্য প্রস্তুত করেছিলেন স্বর্গীয় নৃত্যাচার্য্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য নৃত্য-পরিকল্পনার ভার দেওয়া হয়েছিল আমার উপরে। দৃশ্যপটাদি পরিকল্পনা করেছিলেন স্বর্গীয় রমেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ("সীতা"তেও তিনি ছিলেন শিল্পী চারুচন্দ্রের সহকারী)। ১৩৩১ সালের পঁচিশে অগ্রহায়ণ তারিখে "পাষাণী"র প্রথম অভিনয় হয়। ইন্দ্র ও গৌতমের পরস্পরবিরোধী ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে সে সময়ে আমি যা লিখেছিলুম তা হচ্ছে এই :

"গৌতম ও ইন্দ্র—'পাষাণী'র এই দুটি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় নিখুঁত হয়েছিল। সুরামত্ত, রূপলুব্ধ ও ভোগ-শেষে বিগত-কাম অবস্থায় শিশিরকুমারের অভিনয়ে লঘুচিত্ত ইন্দ্রের চিত্র উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক রূপে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, গৌতমের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের সৌন্দর্য্য সকলে ঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। সাধারণ দর্শকরা 'সেন্সেসানাল' না হ'লে অভিনয় পছন্দ করে না—বিশেষতঃ বাংলা দেশে। ধীর, স্থির, গম্ভীর এবং সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত গৌতমের যে ধারণা শিশিরকুমার দিয়েছেন, সূক্ষ্মরসের রসিককে তা মুগ্ধ করবে নিশ্চয়ই। এ-রকম ভূমিকার চমকপ্রদ বা চিত্তোত্তেজক অভিনয় রস-বিকাশের পরিপন্থী। শিশিরকুমার এখানে হাততালির মোহ এড়িয়ে নিজের অসাধারণ রূপদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

এই সংযমের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর কলাবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।"

প্রতিপক্ষরা "পাষাণী" হস্তগত করতে না পেরে কয়েকজন সারমেয়-জাতীয় লোককে শিশিরকুমারের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে গায়ের জ্বালা নিবারণের চেষ্টা করলেন। ঐ লোকগুলি কাগজে কাগজে ঘোষণা করতে লাগল—"পাষাণী" পুরাণ-বিরোধী। এই পালা মঞ্চস্থ ক'রে শিশিরকুমার হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তির উপরে আঘাত করতে চান, প্রভৃতি। কিন্তু জনসাধারণ সে সব যুক্তিহীন চীৎকার গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে না। "পাষাণী"ও অচল হ'ল না, হিন্দুধর্ম্মও কোন আঘাত অনুভব করলে না। শিশিরকুমারের তারকা ঊর্দ্ধগামী হয়েই রইল, ধূলো-কাদা মেখে নত হ'ল খালি প্রতিপক্ষদেরই মাথা।

বাইশ

মনোমোহন নাট্যমন্দিরে "পাষাণী"র পর আর একখানি নূতন নাটক খোলা হয়—"পুণ্ডরীক"। ভিক্টর হিউগোর একখানি বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বন ক'রে স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার শ্রীশচন্দ্র বসু এই পালাটি রচনা করেছিলেন। শ্রীশচন্দ্র কেবল নাট্যরসিক ছিলেন না, তিন যুগ আগে চৌরঙ্গীর অধুনালুপ্ত রয়েল থিয়েটারে (রঙ্গালয়টি ছিল গ্রাণ্ড হোটেলের ভিতরে। পরে আগুন লেগে পুড়ে যায়) এডউইন আর্নল্ডের "লাইট অফ এসিয়া" নাটকে অন্যান্য ইংরাজ নট-নটীর সঙ্গে তাঁকে আমরা বুদ্ধদেবের ভূমিকায় অভিনয় করতেও দেখেছি। তারও অনেক আগে (১২৯৯ সালে) তিনি সঙ্গীত সমাজে রবীন্দ্রনাথের "গোড়ায় গলদ" পালায় চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনাশক্তি উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাই ভিক্টর হিউগোর আখ্যানবস্তু এবং শিশিরকুমার, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাসুন্দরী ও চারুশীলা প্রভৃতির মত নট-নটীর সাহায্যলাভ ক'রেও নাট্যকাররূপে তিনি জনপ্রিয় হ'তে পারেন নি।

আমরা সে সময়ে অবাক হয়ে ভেবেছিলুম, "পুণ্ডরীকে"র মত দুর্ব্বল নাটক শিশিরকুমারের দ্বারা নির্ব্বাচিত হ'ল কেমন ক'রে? কিন্তু তারও পরে আরো কোন কোন নিশ্চিত রূপে নিম্নশ্রেণীর পালা নির্ব্বাচন ক'রে শিশিরকুমার আমাদের আরো বেশী অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। যেমন "সরমা"। শ্রীশচন্দ্রর "পুণ্ডরীকে"র মধ্যে তবু ভিক্টর হিউগোর ছায়া ছিল, কিন্তু "সরমা"র মধ্যে আমরা উল্লেখ্য কোন কিছুই খুঁজে

পাই নি। যাঁর দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের "তপতী"র দিকে আকৃষ্ট হয়, যিনি বিশ্বকবির "রক্তকরবীর" অভিনয় করবার জন্যে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন (যদিও সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নি), তিনি যে কেন "পুণ্ডরীক" ও "সরমা" প্রভৃতির মত পালা নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এ রহস্য আজ পর্য্যন্ত আমরা বুঝতে পারি নি। এবং এ সব ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের চেষ্টা সুফলপ্রসবও করে নি। তাঁর নাট্যজীবনের সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগেও নিজের অতুলনীয় প্রতিভার সাহায্যেও তিনি রক্ষা করতে পারেন নি ঐ শ্রেণীর কুনাটককে।

কিছুদিন পরে শিশিরকুমারের নূতন কর্ম্মক্ষেত্র হ'ল কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে "নাট্যমন্দিরে"। আমাদের মতে ঐখানেই শিশিরকুমার নিজের প্রতিভাবৈচিত্র্য দেখাবার চরম সুযোগ লাভ করেছিলেন। ঐখানে নাট্যকলার নানা বিভাগে নানা রূপে তিনি এমন ভাবে দেখা দিয়েছিলেন যে বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অমর ক'রে রেখেছেন নিজের সঙ্গে "নাট্যমন্দিরে"রও নাম। আগেই বলেছি, শিশিরকুমারের দ্বারা অভিনীত প্রত্যেক নাটকের প্রত্যেক ভূমিকার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলবার জন্যে আমরা এই আলোচনায় নিযুক্ত হইনি। আমরা কেবল তাঁর অধিকতর স্মরণীয় কীর্ত্তিগুলিরই অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে চাই।

"নাট্যমন্দিরে"র প্রথম স্মরণীয় দান হচ্ছে, শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী"। মেলো-ড্রামার দ্বারা সমাচ্ছন্ন বাংলা রঙ্গালয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী নাটক বলতে "ষোড়শী"কেই বুঝায়। আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যুগের আর কোন নাটকই তার সঙ্গে তুলনীয় হ'তে পারে নি। বাহুল্যহীন তার সৌন্দর্য্য, সূক্ষ্ম তার ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত, অপূর্ব্ব তার মনোবিজ্ঞানের আলো-ছায়া। "ষোড়শী"র প্রধান পুরুষ-ভূমিকায় (জীবানন্দ) শিশির-

কুমারের অভিনয় দেখে তখন আমরা যা বলেছিলুম, এখানে তারই কতক কতক আবার শুনিয়ে রাখি।

শিশিরকুমারের শক্তি ও কলাজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান আমরা এই জীবানন্দের ভূমিকার মধ্যে লাভ করেছি। শরৎচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার সঙ্গে শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার মিলনে যে কি মধুর সুধার আস্বাদ লাভের সুযোগ উপস্থিত, না দেখে তা ধারণা করা অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব! শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্যে এ হচ্ছে আর এক অভিনব সৃষ্টি,, নূতন রূপের তরঙ্গ, না-দেখা ভাবের মূর্ত্তি!

রঙ্গালয়ের জীবানন্দ কোথাও কর্ণভেদী গর্জন বা হস্তপদের প্রচণ্ড আস্ফালন করেনি কিংবা মুখ বিকৃত ক'রে কোলের ছেলেদের ককিয়ে তোলেনি; অথবা চলচ্চিত্র ও বিলাতী অভিনয়ের সচিত্র কেতাব থেকে হরেকরকম ভঙ্গি চুরি ক'রে আমাদের চোখকে চমকে দিতে পারে নি। কিন্তু এ-রকম ভূমিকায় যা পাওয়া উচিত আমরা তা থেকে কিছুমাত্র বঞ্চিত হইনি। বর্ত্তমানযুগে শিশিরকুমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেন? তিনি এখানকার আর সব নটের চেয়ে সরল ভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারেন। এবং তিনি কেবলমাত্র স্বাভাবিকতার মুখ চেয়ে থাকেন না, উপরন্তু স্বাভাবিকতাকে নিজের ঈপ্সিত আকারের মধ্যে এনে স্বেচ্ছামত রূপ দিতে পারেন—ভাস্করের হস্তে কর্দ্দমপিণ্ড যেমন তাঁর স্বেচ্ছামত আকার লাভ করে। পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম দৃশ্যে শিশিরকুমারের অভিনয়ে বিশেষ ক'রে যে সৌন্দর্য্য, যে ভাববৈচিত্র্য ও যে হাসি কান্নার প্রশান্ত ইঙ্গিত ফুটে ওঠে, দর্শকের হৃদয় তাতে মৌন প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারে না। জীবানন্দের ভূমিকায় আমরা যা দেখেছি তা অভিনয় নয়,—অভিনয় বললে তাকে যেন ছোট করা হয়,—আসলে তা হচ্ছে সৃষ্টি, স্বাধীন সৃষ্টি—যা নাটকের মুখাপেক্ষা করে

না। আমাদের বিশ্বাস, শিশিরকুমার জীবানন্দের স্রষ্টার মানস-কল্পনাকেও অতিক্রম করেছেন।

এইজন্যেই হয়তো ১৩৩৫ সালে অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিসভায় গত যুগের অন্যতম প্রধান নট অমৃতলাল বসু বলেছিলেন: "পার্টে জীবন দেবার ক্ষমতা ছিল তার (অর্দ্ধেন্দুর) অপূর্ব্ব। এ যুগে দেখতে পাই তা একমাত্র শিশিরের আছে। 'ষোড়শী'র জীবানন্দের মত wretched part-এ dignity দেওয়া একমাত্র শিশিরেরই সম্ভব।"

এই পালায় ভূমিকাগ্রহণ করেছিলেন স্বর্গীয় অমলেন্দু লাহিড়ী, স্বর্গীয় যোগেশ চৌধুরী, স্বর্গীয় শৈলেন চৌধুরী, স্বর্গীয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরবি রায় এবং স্বর্গীয়া চারুশীলা (ষোড়শীর ভূমিকায় তাঁরও অভিনয় হয়েছিল অভাবিত রূপে চমৎকার) প্রভৃতি। অভিনয়োপযোগী দৃশ্যপট অঙ্কন ক'রে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন স্বর্গীয় শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নাট্যমন্দিরের আরো যে সব স্মরণীয় অবদান ইতিহাসে লিখে রাখবার যোগ্য, তা হচ্ছে "দিগ্বিজয়ী", "বিসর্জ্জন", "তপতী", "সধবার একাদশী" ও "শেষরক্ষা" প্রভৃতির প্রথম শ্রেণীর অভিনয়। এই সব নাট্যাভিনয়ের কথা যখন স্মরণ হয়, তখন বাংলা দেশের বর্ত্তমান নাট্যজগতের রিক্ততা যেন আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তেইশ

শিশিরকুমার সম্বন্ধে আমাদের যা বক্তব্য, আমরা প্রায় তার শেষের দিকে এসে পড়েছি। শিশিরকুমার আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তার অধিকাংশই আমি ভালো ক'রে দেখবার সুযোগ পেয়েছি বটে, কিন্তু তার প্রত্যেকটিরই সম্পূর্ণ পরিচয় দেবার জন্যে বর্ত্তমান আলোচনায় নিযুক্ত হইনি। এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, গিরিশোত্তর যুগের বাংলা নাট্যজগতের মধ্যে শিশিরকুমারের প্রতিভা ও পরিকল্পনা কতখানি নূতন ভঙ্গি ও ভাব ও রস এবং যুগোপযোগী সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে পেরেছে, তারই সঙ্গে জনসাধারণকে ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত করা। আমার মতে "সীতা" নাট্যানুষ্ঠানের (পূর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত "সীতা"র এখনকার পুনরভিনয়ে নয়) মধ্যেই শিশির-প্রতিভার আসল বিশেষত্ব প্রায় পরিপূর্ণরূপেই প্রকাশ পেয়েছিল। এবং সেইজন্যেই "মনোমোহন নাট্য মন্দিরে" অভিনীত "সীতা"র নানা বিভাগ নিয়েই আমি কতকটা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তার মধ্যেই যাঁরা শিশিরকুমারকে একজন অদ্বিতীয় গোটা শিল্পীরূপে দেখতে পাবেন না, আরো ভালো ক'রে তাঁদের বোঝাতে যাওয়া বাহুল্য ব'লেই মনে করি।

আজও রামের ভূমিকায় শিশিরকুমার কেন অভিনয় করেন, তা নিয়েও আমি কালি-কলমের সাহায্যে কোন আলোচনা করতে চাই না। আজকের "সীতা"র সৌন্দর্য্য অনেক দিক দিয়েই যথেষ্ট রিক্ত হয়ে পড়েছে বটে এবং রামের ভূমিকায় শিশিরকুমারকে আর আগেকার মত মানায়ও না বটে (তিনি তখন ছিলেন নবীন, এখন হয়েছেন প্রাচীন), তবু তাঁর কথন, চলন বা ভাবভঙ্গ ও অঙ্গভঙ্গ আজও আছে আগেকার মতই

অপূর্ব্ব শ্রীমন্ত হয়ে। হয়তো এই একটিমাত্র কারণেই গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মত "সীতা"র ধ্বংসাবশেষ দেখবার জন্যে এখনো লোকের আগ্রহ এত বেশী। সুতরাং আমি এখানে মুখের কথায় বা হাতের লেখায় চিঁড়া ভেজাবার চেষ্টা করব না। প্রবাদে বলে, 'সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই।' কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের নাট্যজগতে 'সে রাম' আজও বিদ্যমান। যাঁদের খুসি হবে আমাদের মুখাপেক্ষী না হয়েই তাঁকে গিয়ে দেখে আসতে পারেন।

"সীতা"র পর শিশিরকুমারের নাট্যজীবনের প্রধান ঘটনা হচ্ছে গিরিশচন্দ্রের "জনা"র পুনরভিনয়। এখানেও তিনি তাঁর নিজস্ব বিশেষত্বের পরিচয় দিতে ত্রুটি করেননি। বাংলা রঙ্গালয়ে "জনা" প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। তখনকার অভিনয় আমি দেখিনি, আমি সে সময়ে শিশুমাত্র। কিন্তু "জনা"র অভিনয় অতিশয় জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় নানা সাধারণ ও সৌখীন রঙ্গালয়ে বার বার তার পুনরভিনয়ের আয়োজন করা হ'ত। গত শতাব্দীতেই বাল্যকাল থেকে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন রঙ্গালয়ে আমি "জনা"র পুনরভিনয় দেখেছি অন্তত নয়-দশবার। কিন্তু প্রত্যেকবারেই প্রত্যেক অভিনয়ের মধ্যেই এমন একটা সাদৃশ্য থাকত যে বেশ বোঝা যেত, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শিল্পীরা একই পুরাতন পরিকল্পনা অনুসারে নিজের নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছেন, কারুরই নেই স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রকাশ করবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা। সেকালের বাংলা নাট্যজগতে স্তম্ভিত হয়ে থাকত কালচক্রের গতি। এমন কি নবযুগেও আর্ট থিয়েটার পুনরভিনয়ের আয়োজন ক'রে আমাদের যেন এই কথাটাই জোর ক'রে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের আর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের যুগধর্ম্মের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই।

শিশিরকুমারকে সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকদের কেউ যখন চিনত না এবং তিনি যখন সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনেতা, তখনই তাঁর পরিচালনায় পুনরভিনীত "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" দেখে আমি নিশ্চিতরূপে অনুভব করেছিলুম, বাংলা নাট্যজগতে তিনিই হ'তে পারেন নব যুগধর্ম্মের হোতা। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত পুরাতন পালা "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" যখন বিশ শতাব্দীতে শিশিরকুমারের হাতে আসে, তখন সবে শেষ হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধ। কিন্তু তাঁর নব পরিকল্পনার ইন্দ্রজালের মহিমায় ঐ পালাটি তার সমস্ত প্রাচীনতা পরিহার ক'রে হয়ে উঠেছিল একটি একেবারে আনকোরা ও তাজা পালা এবং তার দৃশ্যের পর দৃশ্যে ছিল নূতন নূতন অভাবিত বিস্ময়।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার "জনা"কে ঢেলে সাজলেন যুগোপযোগী রুচিকে মর্য্যাদা দেবার জন্যে। তার কোন কোন দৃশ্য বা বাক্যাংশ পরিবর্জিত হ'ল, মূল রসকে অধিকতর ঘনীভূত ক'রে তোলবার জন্যে। গানে নতুন সুর দেওয়া হ'ল না বটে, কিন্তু পুরাতন সুরকেই এমন সুকৌশলে ব্যবহার করা হ'ল যাতে ক'রে নবযুগের শ্রোতারা তুষ্ট হ'তে পারে। স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা অনুসারে নাচগুলি নূতনভাবে তৈরি করা হ'ল। সাজপোষাক ও দৃশ্যপটও পরিকল্পিত হ'ল আধুনিক রসানুভূতিকে প্রবুদ্ধ করবার জন্যে। প্রয়োগকর্ত্তা শিশিরকুমার এমন ভাবে নাট্যশিক্ষা দিলেন, যার মধ্যে প্রাচীন পরিকল্পনার চিহ্নমাত্র ছিল না। যখন গিরিশ-যুগে বিখ্যাত তিনকড়ি জনা সাজতেন, তখন এই পালাটির সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র ভাবে ধরলে নিশ্চিতরূপে বলতে পারি, নূতন হয়েছিল পুরাতনের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত। তারাসুন্দরী (জনা), শিশিরকুমার (প্রবীর) ও চারুশীলা (নায়িকা) অভিনয়ের দিক দিয়েও

অতুলনীয় নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন। নবযুগের জনসাধারণ নূতন "জনা"কে সাদর অভিনন্দন দিলে বটে, কিন্তু প্রচীনপন্থীদের একদল গেলেন ক্ষেপে,"জনা"কে অঙ্গহীন ক'রে গিরিশচন্দ্রকে অপমান করা হয়েছে ব'লে তুমুল আন্দোলন করতে লাগলেন। কিন্তু সে আন্দোলন ধোপে টেঁকেনি। এক শ্রেণীর নির্ব্বোধ কিছুতেই বুঝতে চায় না যে, সেকালের নাটককে একালের উপযোগী না ক'রে তুললে নাট্যকারের পরমায়ুও হয় না দীর্ঘস্থায়ী। যুগে যুগে পরিবর্জন ও পরিবর্ত্তনের সাহায্যেই সেক্সপীয়ারের নাটকাবলী আজ পর্য্যন্ত সজীব ও সচল হয়ে আছে পাশ্চাত্য রঙ্গালয়ে। আজকাল বাংলা দেশের বিভিন্ন রঙ্গালয়েও গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য নাটকেও প্রচুর পরিবর্জনের সাহায্য নেওয়া হয়, কিন্তু সেদিন যে-সব মুরুব্বি শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, আজ তাঁরা একেবারেই নির্ব্বাক হয়ে আছেন। এথেকেই বেশ বোঝা যায়, তাঁদের ঐ কার্যে প্রবৃত্ত করেছিল গিরিশচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ নয়, শিশিরকুমারের প্রতি অত্যধিক রাগ।

চব্বিশ

শিশিরকুমার কেবল গম্ভীর রসের পরিবেষক নন। এদেশে এমন কোন কোন অভিনেতা নাট্যজগতে অক্ষয় যশ অর্জন ক'রে গিয়েছেন, যাঁদের শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানত গম্ভীর রসের মধ্যেই। যেমন স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র। কিন্তু ওঁদের বড় ব'লে মানলেও গোটা অভিনেতা ব'লে ধরা যায় না। একাধারে গম্ভীর ও হাস্য রসের ক্ষেত্রে অনুপম দক্ষতা দেখাতে পারতেন ব'লেই গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও দানীবাবু ছিলেন অমৃতলালেব চেয়ে উচ্চশ্রেণীর শিল্পী। শিশিরকুমারকেও অনায়াসে শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যায়।

কিন্তু হাস্যরসও আছে দুরকম,—উচ্চ ও নিম্ন (যাকে বলে 'লো-কমিক') শ্রেণীর। অর্দ্ধেন্দুশেখর দুই শ্রেণীর হাস্য রসেই নৈপুণ্য দেখাতে পারতেন। জলধর ও আবুহোসেনের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের এবং গদাধর ও দুলালচাঁদের ভূমিকায় দানী বাবুর 'লো-কমিক' অভিনয় এদেশে বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু এ শ্রেণীর ছ্যাবলা চরিত্র শিশির-কুমারকে কোনদিন আকৃষ্ট করে নি (যদিও তিনি একবার দুলালচাঁদের ভূমিকাতেও দেখা দিয়েছেন)। তিনি হচ্ছেন উচ্চতর শ্রেণীর হাস্যরসের স্রষ্টা। "মৃণালিনী"র দিগ্বিজয় ভূমিকা তিনি গ্রহণ করতে রাজি হবেন না। কিন্তু "চিরকুমার সভা"র চন্দ্রবাবু ও "শেষরক্ষা"র চন্দ্র সেজে প্রেক্ষাগারকে হাস্যকলরবে মুখরিত ক'রে তুলতে পারবেন। আবার একই ভূমিকায় তিনি যে একসঙ্গে গম্ভীর ও হাস্যরসকে সমান কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তাঁর দ্বারা অভিনীত জীবানন্দ ও মাইকেল প্রভৃতি বহু ভূমিকাই সে সত্য প্রমাণিত করবে। "সধবার

একাদশী”র নিমচাঁদের ভূমিকাতেও তিনি ‘সিরিয়ো-কমিক’ অভিনয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাতে পেরেছেন।

“নাট্যমন্দিরে” তিনি ঐতিহাসিক নাটক “দিগ্বিজয়ী” খুলে আবার এক অতুলনীয় কীর্তি অর্জন করেন। কেবল অভিনয়ের মধ্যে নয়, “দিগ্বিজয়ী”র প্রয়োগ-নৈপুণ্যের মধ্যেও সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছিল শিশির-প্রতিভার অবিমিশ্র শীলমোহর। প্রয়োগ-কৌশলের দিক দিয়ে “সীতা”র পরেই স্থান লাভ করতে পারে এই “দিগ্বিজয়ী”। এবং নাটক হিসাবেও শেষোক্ত পালাটিই উচ্চতর শ্রেণীর; এমন কি “দিগ্বিজয়ী”কেই আমি যোগেশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ব’লে মনে করি। নামভূমিকায় শিশির-কুমারের অভিনয় নিয়ে বহুকাল পূর্বেই আমি সুদীর্ঘ আলোচনা করেছি। সে আজ হ’তে চলল প্রায় দুই যুগ আগেকার কথা। আমার বক্তব্য ছিল সংক্ষেপে এই :

তাজমহলের উপযোগী বর্ণনা আজও পাঠ করি নি—তাজমহলের স্রষ্টাও তাকে ভাষায় ফোটাতে পারতেন ব’লে বিশ্বাস করি না। “দিগ্বিজয়ী”র অভিনয় ঐ রকম, ভাষায় তা অবর্ণনীয়। তবে সে সম্বন্ধে দু-চারটে ইঙ্গিত দিতে পারি মাত্র। প্রথমত, কি সূক্ষ্ম “নাদির সাহে”র অভিনয়! অসংখ্য স্থলেই শিশিরকুমার তাঁর মুহূর্তস্থায়ী অঙ্গভঙ্গি বা কণ্ঠের সামান্য অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনির দ্বারা এমন বৃহৎ ভাব বা অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছেন, এখনকার আর কোন অভিনেতাকে যা করতে দেখিনি।

প্রথম অঙ্কে নাদির সাহ যে-ভাবে সিতারার কাছে প্রেম নিবেদন করেছে, তেমন অদ্ভুত ও মৌলিক উপায়ে যে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ না ক’রেও প্রেম জানানো যায়, না দেখলে আমরা তা বিশ্বাস করতুম না। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! কৃত্রিম ও চেষ্টাকৃত দরদ দেখানো নেই, বিকৃত থিয়েটারি কণ্ঠস্বর নেই, দৃশ্যকে জমকালো করবার জন্যে হরেক

রকমের প্যাঁচ নেই, অথচ কত সহজে পৃথিবীর এই অতি-পুরাতন প্রেম নূতন রসের ধারায় দর্শকদের চিত্ত ক'রে তুলেছে স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ। চতুর্থ অঙ্কের সর্বশেষে ভারত-নারীর করুণ আত্মনিবেদনের পরে নাদির সাহের সেই পা টানতে টানতে চলা যে কতখানি ভাবের সন্ধান দিয়েছে, তা অনুভব করতে পেরেছে প্রত্যেক রসিক দর্শকই। তথাকথিত বিখ্যাত অভিনেতারা এখানে হয়তো প্রচণ্ড মুখভঙ্গি ও খানিকক্ষণ ধ'রে ছুটোছুটি আর হস্তপদ সঞ্চালনের দ্বারা সমস্ত দৃশ্যটিকে 'মেলো-ড্রামাটিক' ক'রে না তুলে ছাড়তেন না। আমরা দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলুম, কিন্তু নাদির-ভূমিকার সর্বত্রই ছড়ানো আছে এমনি সব সৌন্দর্যের কণা। হ্যাঁ, কণা বটে, কিন্তু সে যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর প্রকাশ।

কে নাদির, কে শিশিরকুমার বোঝা যায় না। ভূমিকার ভিতরে অভিনেতা ডুবে গেছেন, না অভিনেতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছে ভূমিকা? নাদির সাহের ভূমিকায় আমরা কোন নটের কৃত্রিম অভিনয় দেখি নি—শতাব্দীর অন্ধ যবনিকা ঠেলে চোখের সামনে জ্যান্তো হয়ে উঠেছে ইতিহাসের সত্যিকার নাদির সাহ এবং নিজেদের জাগ্রত অনুভূতির মধ্যে আমরা লাভ করেছি তারই রক্তের স্রোত, মাংসের তপ্ততা ও হৃৎপিণ্ডের নৃত্য। বিস্মিত হয়েছি, শঙ্কিত হয়েছি, চমৎকৃত হয়েছি। নাদির-চরিত্রের আর একটি বড় কথা শিশিরকুমার ভুলে যান নি। রাজপোষাকের হীরা-জহরতের ভিতর থেকে নাদিরের চাষাড়ে ভাব, বিদ্যাহীন মন, ভদ্রতাহীন রুক্ষ প্রকৃতি ও অঙ্গভঙ্গি বাইরে বেরিয়ে এসেছে সর্বদাই। অথচ তার মধ্য থেকেই নাদিরের ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা ও বুদ্ধির চাতুর্য যতটা প্রকাশ পাবার তা পেয়েছে। শিশিরকুমারের আর্টের একটা মস্ত বিশেষত্ব হচ্ছে, একাধারে তা অভিনয় ও চরিত্র-বিশ্লেষণ।

"দিগ্বিজয়ী"র পরেও শিশিরকুমার আরো অনেক নূতন ভূমিকায়

অভিনয় করেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতেও নিশ্চয় আরো সব নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন; কিন্তু আপাততঃ এইখানেই শেষ হ'ল আমাদের শিশির-প্রসঙ্গ। শিশিরকুমারের বৃহৎ প্রতিভার সমগ্রতা নিয়ে নিঃশেষে আলোচনা করবার শক্তি ও স্থান আমাদের নেই; আশা করি সে চেষ্টা করবেন যোগ্য-তর ব্যক্তি। তবে সর্বশেষে এইটুকু ব'লেই পালা শেষ করতে চাই যে, যারা মোটামুটিভাবে শিশিরকুমারের গুণপনার পরিচয় পেতে চান, আমা-দের আলোচনার মধ্যেই তাঁরা অনায়াসে তা লাভ করতে পারবেন।

কিন্তু এখানে আরো কিছু কথা ফাউ দিতে চাই এবং তা হচ্ছে পঁইষট্টি বৎসরের "যুবক" শিশিরকুমারের অদ্ভুত শক্তির কথা!

মনে প্রশ্ন জাগে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতাদের শক্তি নিম্নগামী হয় কিনা? বিলাতী সমালোচকদের বর্ণনা পাঠ ক'রে জানা যায়, স্যার হেনরি আর্ভিং পরিণত বয়সেও হ্যামলেটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিতেন। বার্ধক্য সারা বার্ণার্ডের নাট্য-প্রতিভাও ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। কিন্তু এর উল্টো দৃষ্টান্তও আছে। বহুকাল আগে মিনার্ভা থিয়েটারে উপরি-উপর দুইদিন আমি "মৃণালিনী"র অভিনয় দেখেছিলুম। পশুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন প্রথম দিন গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিতীয় দিন দানীবাবু। সকলেই জানেন, ঐ ভূমিকাটিতে গিরিশচন্দ্রের নাম একেবারে অতুলনীয়। কিন্তু আমি যখন তাঁকে পশুপতিরূপে দেখেছিলুম, তাঁর দেহ তখন জরায় জর্জরিত। তবু তিনি উচ্চশ্রেণীর অভিনয় করলেন বটে, কিন্তু আমার কাছে তা বিশেষ অসাধারণ ব'লে মনে হ'ল না। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে যুবক দানীবাবু ঐ ভূমিকাতেই দেখা দিয়ে যে তাঁর পিতাকেও ছাড়িয়ে উঠেছিলেন, একথা আজও আমার বেশ মনে আছে। অথচ শিল্পী হিসাবে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দানীবাবুর তফাৎ বোধ হয় আকাশ-পাতাল।

আর সব কলার চেয়ে অভিনয় কলাকেই বেশী নির্ভর করতে হয় দেহের ভালো-মন্দের উপরে। নটের সব চেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে জরা। "জনা" পালায় প্রবীরের ভূমিকায় দানীবাবুর খুব নাম। কিন্তু ষ্টার থিয়েটারের নির্বোধ কর্তৃপক্ষের উপরোধ এড়াতে না পেরে জরাজীর্ণ অক্ষম দেহ নিয়ে ঐ ভূমিকায় নেমে তিনিও নিজের সুনাম রক্ষা করতে পারেন নি। তাই সেদিন যখন প্রচার-পত্রে দেখলুম শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী "রঘুবীরে"র নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, তখন বিস্মিত না হয়ে পারি নি। ম্যাডানের কর্নওয়ালিস থিয়েটারে ত্রিশ-একত্রিশ বৎসর আগে রঘুবীররূপে তাঁকে দেখি, তিনি তখন বলিষ্ঠ যুবক। এতকাল পরে ঐ ভূমিকায় আবার তিনি! কৌতূহলে প'ড়ে অভিনয় দেখতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছিলুম অধিকতর।

ক্ষীরোদপ্রসাদের "রঘুবীর" নাটক রচিত হয়েছিল গত শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং সর্বপ্রথমে তা অভিনীত হয়, মিনার্ভা থিয়েটারে, ১৯০৩ খৃস্টাব্দে। সেই সময়ে আমি একদিন তার অভিনয় দেখেছিলুম বটে, কিন্তু সে অভিনয়ের বিশেষ কিছুই মনে নেই। কেবল এইটুকু স্মরণ আছে, রঘুবীর সেজেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তুলিয়া সেজেছিলেন প্রিয়নাথ ঘোষ। অভিনয় নিশ্চয়ই ভালো হয় নি, কারণ ভালো অভিনয়ের মস্ত গুণ হচ্ছে, একবার দেখলে আর কখনো তা ভোলা যায় না। প্রায় সেই সময়েই "প্রফুল্ল" পালায় যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রকে দেখেছিলুম, কিন্তু আজও চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই সেই জীবন্ত ছবি।

পুরাতন নাটক হ'লেও "রঘুবীরে"র মধ্যে সত্যিকার নাটকত্বের উপাদান আছে যথেষ্ট। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপরে সর্বপ্রথমে তাকে পাংক্তেয় করেছেন শিশিরকুমারই। রঘুবীর হচ্ছে একটি অদ্ভুত চরিত্র, আমাদের নাট্য-সাহিত্যে এ-রকম চরিত্র আর আছে ব'লে স্মরণ হচ্ছে না। জন্ম

তার ডাকাতের ঘরে, দেহের মধ্যে আছে তার দুর্দান্ত ভীল রক্ত। কিন্তু সে লালিত পালিত হয়েছে ঋষিকল্প সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের কাছে। নিজের দেহে অসুরের মতন শক্তি থাকলেও সে তা ব্যবহার করতে চাইত না, প্রাণপণে অহিংসা-ব্রতের মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলত। তারপর একদিন পিশাচের ভয়াবহ অত্যাচারে হ'ল কুম্ভকর্ণের মহা জাগরণ, খ'সে পড়ল সংযম ও সাত্ত্বিকতার খোলস, রঘুবীর ফিরে পেল তার বনবাসী, নির্ম্মম ও দুর্দমনীয় ভীল প্রকৃতি।

রঘুবীর চরিত্রের এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাব শিশিকুমারের অভিনয়ে কি চমৎকারই ফুটে ওঠে! বহুকাল পূর্বেই এই ভূমিকার জন্যে তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে জয়মাল্য অর্জন করেছেন, কাজেই তা নিয়ে আর নূতন প্রশস্তি রচনা করবার দরকার নেই। কিন্তু আমি বলতে চাই অন্য কথা। রঘুবীরের ভূমিকা হচ্ছে যুবকের ভূমিকা এবং যুবক শিশিরকুমারকেই আগে দেখেছি ঐ ভূমিকায়। তারপর কেটে গিয়েছে সুদীর্ঘ ত্রিশ-একত্রিশ বৎসর এবং প্রাচীন শিশিরকুমার আবার দেখা দিলেন যুবক রঘুবীররূপে। কিন্তু আশ্চর্য এই, এতগুলো বৎসরের ভারেও তিনি একটুও নুয়ে পড়েন নি। কোন তরুণ নটও তাঁর রঘুবীরের তারুণ্যকে কিছুমাত্র ম্লান করতে পারবে না। তারপর নিজের দুর্দান্ত ভীল প্রকৃতি ফিরে পেয়ে রঘুবীরের সেই উৎকট উল্লাস ও প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য, পারণত বয়সেও সুন্দর অঙ্গভঙ্গের দ্বারা শিশিরকুমার তার যে ছবি আঁকলেন, ভাষায় বর্ণনা ক'রে তা বুঝানো যাবে না, তা চোখে দেখে প্রাণে উপলব্ধি করবার জিনিস। কলাবিদরা যে নিজেদের কার্য-ক্ষেত্রে এমন ভাবে চিরযৌবনকে ধ'রে রাখতে পারেন, শিশিরকুমারের সেদিনকার অভিনয় দেখবার আগে সে বিশ্বাস আমার ছিল না।

পঁচিশ

কারুর শ্রেষ্ঠতা দেখলেই একদল লোক প্রতিপক্ষতা করবার জন্যে বরাবরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। শিশিরকুমারকেও এঁদের কাছ থেকে বহু গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে এবং আজও তিনি এঁদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে: (১) নাটক ও অভিনয়ের মধ্যে নিজেকেই তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা ক'রে রাখতে চান। (২) বাংলা অভিনয়কলার মধ্যে তাঁর বিশেষ কিছু নিজস্ব দান নেই।

দুটি অভিযোগই হাস্যকর। প্রথম অভিযোগের উত্তর হচ্ছে: সূর্য্য আকাশের পূর্ব্ব বা পশ্চিম প্রান্তে বা মধ্যস্থলে বা অন্য যেখানেই থাকুক, বিপুল শূন্যে তার প্রাধান্য কেউ ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। নিজের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য অন্য দলে গিয়েও শিশিরকুমার যখন অভিনয় করেছেন, তখন তাঁর দিকেই সকলের দৃষ্টি হয়েছে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট। অর্দ্ধেন্দু-শেখরের মত তিনিও বহুবার অতি-ক্ষুদ্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও সকলের চিত্তকে একেবারে সমাচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ (পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ও ঘাতক (রিজিয়া) প্রভৃতি ভূমিকার নাম উল্লেখ করা যায়। রঙ্গমঞ্চের উপরে তাঁর কোন স্বার্থপরতাই আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি, বরং বারংবার এইটেই লক্ষ্য করেছি যে, সহ-শিল্পীদের মুখ চেয়ে নিজের শক্তিকে তিনি পূর্ণতররূপে বিকশিত হ'তে দেননি। এটা কেবল আমরাই নই, আরো অনেকেই লক্ষ্য করেছেন।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন: "মনোমোহন নাট্যমন্দিরে গিয়ে দেখলেম যে-সব অভিনেতা অভিনেত্রীকে শিশিরবাবু নিজের

হাতে গড়ে তুলছেন—আস্তে আস্তে, তাঁরা যাতে তাঁর সমকক্ষতা করতে পারেন, তার কারণে নিজের অভিনয়পটুতা তিনি ইচ্ছা ক'রেই সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে অন্যের অভিনয়টিকে অনেকখানি ফুটে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছেন। বড় যে, সে ছোটদের কল্যাণ কামনা করে নিজের বৃহৎ আওতা অনেকখানি সরিয়ে নিয়েছে, এটুকু আমার কাছে ভারি নূতন লাগলো। ইতিপূর্ব্বে বাংলার কোন রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা এমন ক'রে নিজেকে একপাশ করে রেখেছেন দেখেছি বলে তো মনে হয় না। * * * প্রখর আলোর মতো প্রতিভা যখন সম্পূর্ণ প্রকাশ পেতে চাচ্ছে, তখন কাঁচা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের খাতিরে তার উপরে আবরণ টেনে রাখতে যে কতখানি ধৈর্য্য এবং শক্তি ব্যয় করতে হয় বড় অভিনেতাকে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ সীতাভিনয়ের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত শিশিরবাবুর চলা বলার মধ্যে আমি লক্ষ্য করে এসেছি।"

স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও শিশিরকুমারের এই বিশেষত্ব লক্ষ্য ক'রে লিখেছিলেন: "শিশিরকুমার কেবলমাত্র নিজের অভিনয়ের বাহাদুরি দেখিয়ে ক্ষান্ত থাকতে চান না; তিনি যে নতুন অভিনয়-পদ্ধতির প্রবর্ত্তক সেই পদ্ধতিকে তিনি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সেই জন্যই কাঁচা কচি অভিনেতাদের দিকেই তাঁর টান বেশী। * * * * প্রতিভার গুণই এই যে, সে নিজের শক্তিকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখে না—সূর্য্যকিরণের মতো সে বিচ্ছুরিত হয়ে অন্ধকারকে আলোকিত করে তোলে।"

দ্বিতীয় অভিযোগের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হবে না, তবে যতটুকু পারি ব'লে নি। আজ বাংলা অভিনয়-কলা জীবন্ত হয়ে আছে, প্রধানত শিশিরকুমারেরই নিজস্ব দানের উপরে নির্ভর ক'রে। অথচ এমন কোন কোন চোখ-থাকতে-কাণাও আছে, যারা এখানে তাঁর

কোন বিশেষ দান দেখতে পায় না। শিশিরকুমারকে যে "নতুন অভিনয় পদ্ধতির প্রবর্ত্তক" ব'লে স্বর্গীয় মাণলাল উল্লেখ করেছেন এবং যার প্রভাবে গিরিশোত্তর যুগের বস্তাপচা পদ্ধতি অনতিবিলম্বেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, বাংলা রঙ্গালয়ে সেইটেই হচ্ছে তাঁর স্মরণীয় দান। সর্ব্বপ্রথমে শিশিরকুমার আমাদের নাট্যজগতে আত্মপ্রকাশ না করলে নবযুগের আর কোন শিক্ষিত ও শক্তিশালী শিল্পী যে বাংলা রঙ্গালয়ের পথ মাড়াতে ভরসা করতেন, এমন বিশ্বাস আমার নেই। শিশিরকুমারের দেখাদেখি এলেন রাধিকানন্দ, এলেন নরেশচন্দ্র। তারপর এলেন নির্ম্মলেন্দু। তিনি তো নিজের মুখেই আমার কাছে স্বীকার করে'ছিলেন: "শিশিরবাবু অগ্রবর্ত্তী না হ'লে আমি কিছুতেই পাবলিক থিয়েটারে যোগ দেবার সাহস সঞ্চয় করতে পারতুম না।"

তারপর শিশিরকুমারের আর একটি অপূর্ব্ব দান হচ্ছে তাঁর নাট্য-শিক্ষকতা। এই শিক্ষকতার শক্তি যে কতটা অসাধারণ, একটি বিষয় উল্লেখ করলেই সকলে তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন। মনোমোহন নাট্যমন্দিরের একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ষ্টার মঞ্চের আর্ট থিয়েটার। দানীবাবু থেকে আরম্ভ ক'রে তখনকার নূতন ও পুরাতন অধিকাংশ সুবিখ্যাত নট-নটীই ঐ সম্প্রদায়কে সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধিশালী ক'রে তুলেছিলেন। তাঁদের প্রতিযোগী রূপে শিশিরকুমার যাঁদের এনে দাঁড় করালেন, তাঁরা হচ্ছেন: ললিতমোহন লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রমোহন রায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ বসু, তারাকুমার ভাদুড়ী ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে—সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকদের কাছে যাঁরা ছিলেন তখন সম্পূর্ণরূপেই অপরিচিত। সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র অল্পবিস্তর নাম-করা অভিনেত্রী ছিলেন শ্রীমতী নীরদা, কিন্তু "সীতা"য় তিনিও

পেয়েছিলেন মাত্র এক দৃশ্যের একটি ছোট ভূমিকা। তবু এই অবিখ্যাতরাই শিশিরকুমারের হাতে তৈরি হয়ে পূর্ব্বোক্ত সুবিখ্যাতদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে দর্শকদের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। এমন কি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পর্যন্ত তাঁদের শক্তি দেখে লিখেছিলেন : "আমি পূর্ব্বে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে সকল অভিনয় দেখিয়াছি সে অভিনয়ে অপ্রধান চরিত্রগুলি কোন দিনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু শিশিরকুমারের সম্প্রদায়ের অপ্রধান অংশগুলির অধিকাংশই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।" নাট্যাচার্য্যের পক্ষে এর চেয়ে বড় সুখ্যাতি আর কিছু থাকতে পারে না।

ছাব্বিশ

মাঝে মাঝে অভিযোগ হয়, শিশিরকুমারের প্রভাবে বাংলা দেশে প্রথম শ্রেণীর আধুনিক নাট্যসাহিত্য সৃষ্ট হয়নি। এবং এর জন্যেও অনেকে তাঁকেই দায়ী ক'রে ছাপার হরফে বিদ্যা জাহির করতে লজ্জিত হন না। ওঁদের বিশ্বাস, প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার তৈরি করা হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। হয়তো ওঁদের ঐ বিশ্বাসের মধ্যে কিছু কিছু যুক্তির অভাব নেই। কিন্তু তা যতটা অনুমানমূলক, ততটা ব্যবহারমূলক নয়। কেন নয়, অল্পবিস্তর আলোচনার দ্বারা সেটা বোঝাবার চেষ্টা করব।

ইলিয়োনোরা ডিউসের অভিনয় নিয়ে আর্থার সিমন্স ও বার্নার্ড শ প্রভৃতি বহু সমালোচক উচ্ছ্বসিত ভাষায় সে সব আলোচনা করেছেন, তা পাঠ করলে বলতে হয় তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পী আধুনিক নাট্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন নি। য়ুরোপ ও আমেরিকার যে কোন দেশে তিনি গিয়েছেন, অর্জন করেছেন সাম্রাজ্ঞীর মত অভিনন্দন। তাঁর কোন কোন নিপুণতার বর্ণনা পড়লে তা অমানুষিক ব'লেই মনে হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এমন অতুলনীয় শিল্পীর মুখ থেকেই বেরিয়েছে এই অভাবিত উক্তি: "আমি চেষ্টা করেছি। আমি সফল হ'তে পারিনি। আমার প্রতি দণ্ডবিধান হয়েছে, আমাকে সার্দো ও পিনেরোর নাটকাবলী অভিনয় করতে হবে।"

বলা বাহুল্য, আধুনিক লেখক ও জনপ্রিয় হ'লেও সার্দো ও পিনেরো যথার্থ উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার নন। ফ্রান্সের সারা বার্ণার্ডের ভাগ্যেও ঘটেছে ঐ দুর্দ্দশা। আধুনিক যুগের কোন প্রতিভাবান লেখকই তাঁর জন্যে

প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনা করতে পারেন নি। ইতালীর অমন যে অদ্বিতীয় আধুনিক লেখক দান্নুনশিয়ো, ডিউসের প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে রচনা করলেন একাধিক নাটক এবং ডিউসের প্রতিভার প্রসাদে সেগুলির কোন কোনখানি বিস্ময়কর ও কল্পনাতীত সাফল্য লাভও করেছিল বটে, কিন্তু উচ্চতর নাট্যসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করতে পারে নি। তাই ডিউসকে বার বার ফিরে যেতে হয়েছে অতীতের দিকে এবং মনের খেদে বলতে হয়েছে, "সেক্স্‌পিয়ার এবং গ্রীক নাট্যকারদের পরে আর কোন নাট্যকার জন্মগ্রহণ করেন নি। * * * ইবসেন? ইবসেন হচ্ছেন চেয়ার টেবিলে ভরা এই আধুনিক ঘরের মত। তোমার ঘড়ীর চেনে বিশটা কি পঁচিশটা কড়া আছে, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার কি? (ইবসেনের সৃষ্ট) হেডডা গ্যাবলার ও নোরার মত চরিত্র আমি চাই না। আমি চাই সৌন্দর্য্য ও জীবনের অগ্নিশিখা।" অথচ সমালোচকরা বলেন, ইবসেনের নাটকে আর কোন শিল্পীই ডিউসের মত ভালো অভিনয় করতে পারেন নি। আধুনিক নাট্যকারদের সৃষ্টি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ব'লে প্রথম শ্রেণীর নাট্যশিল্পীর প্রতিভা তার মধ্যে স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। সমালোচক আইভর ব্রাউন বলেন, আধুনিক রঙ্গালয় যে একঘেয়ে উঠেছে, প্রধানত তার জন্যে দায়ী হচ্ছেন আধুনিক নাট্যকারাই "who insist on turning out the same drawing room dilemmas of nincompoops, small plays about small people."

বিলাতের আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্যর হেনরি আভিংয়ের নাট্যজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাঁকেও বার বার ফিরে যেতে হয়েছে মধ্যযুগের সেক্সপিয়ার ও গেটে ও স্কট প্রভৃতির দিকে। আধুনিক যুগের বার্নার্ড স পর্য্যন্ত তাঁর উপযোগী নাটক রচনা করতে পারেন নি, স'য়ের নাটক তিনি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমালোচক ম্যাক্স

বীরবম বলছেন, "আভিং যে ভালো ভালো আধুনিক নাট্যকারদের উৎসাহ দেন নি, এজন্যে তাঁকে দায়ী করা যায় না। এর জন্যে দোষারোপ করা যেতে পারে লিসিয়াম থিয়েটারের বৃহৎ আকারের উপরে।" আধুনিক নাট্যকাররা সাধারণত জন চার-পাঁচেক ছোট ছোট মানুষ নিয়ে রচনা করেন ছোট ছোট পালা। তা ক্ষুদ্রতর রঙ্গালয়ের উপযোগী হ'তে পারে, কিন্তু সুবৃহৎ রঙ্গমঞ্চের উপরে অভিনীত হ'লে যথেষ্টরূপেই ক'মে যায় সেগুলির আকর্ষণী-শক্তি। সেদিন একখানি নাম-করা আধুনিক নাটক পাঠ করলুম, তার তিনটি অঙ্ক জুড়ে আছে মাত্র দুইজন পাত্র-পাত্রী। কেবল মাঝে মাঝে এসে দুই-একটি কথা কয়ে যায় একজন দাসী। এ-রকম নাটক যতই উচ্চশ্রেণীর হোক, বাংলা দেশের কোন সুবৃহৎ রঙ্গালয়ে দর্শক আকর্ষণ করতে পারবে না।

কিন্তু আভিং আধুনিক নাট্যকারদের একেবারে বর্জন করেন নি। তাঁর সব-চেয়ে বিখ্যাত ভূমিকা হচ্ছে "The Bell" নাটকের ম্যাথিয়াসের ভূমিকা (বাংলা দেশেও ঐ নাটক অবলম্বনে রচিত "শঙ্খধ্বনি" পালায় একই ভূমিকায় শিশিরকুমার স্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন)। কিন্তু আধুনিক হ'লেও ও-নাটকখানি আধুনিক রীতি অনুসারে রচিত নয়। ওর মধ্যে রং আছে, ঘটনা আছে, অভিনয়ের উপযোগী গতিশীল নাটকীয় ক্রিয়া আছে। এ সব দিক দিয়ে প্রাচীন নাট্যকাররা শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পীদের যতটা আকৃষ্ট করেন, একালকার বর্ণবিহীন, একঘেয়ে, বাক্যপ্রধান ছোট ছোট নাটকে দেখানো ড্রয়িং-রুমের ছোট ছোট মানুষগুলি ততটা করতে পারে না। তাই ডিউস, সারা বার্নার্ড ও আভিং প্রভৃতি শিল্পীরা অতীতের ভাণ্ডার খুঁজে নাটক নির্ব্বাচন করতে বাধ্য হয়েছেন, নয় অবলম্বন করেছেন আধুনিক যুগের মেলো ড্রামার লেখকগণকে। এই বারে বাংলা নাট্যকারদের কথা বলব এবং সেই সম্পর্কে হবে শিশিরকুমারের কথাও।

সাতাশ

কলিকাতার ইংরেজী রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখে উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে শিক্ষিত বাঙালীদেরও মনে 'থিয়েটার' করবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হ'ল। কিন্তু থিয়েটার যে হবে, বাংলা ভাষায় নাটক কোথায়? প্রথম প্রথম ইংরেজী নাটক এবং সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদের সাহায্যেই বাংলার ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের সখ মেটাতে লাগলেন। তারপর পুরস্কার বা পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে তাঁরা লেখকদের উৎসাহিত করবার চেষ্টা করলেন এবং সে চেষ্টা বিফল হ'ল না। আত্মপ্রকাশ করলেন বাংলা ভাষার প্রথম সামাজিক নাটক প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮৫৭ খৃঃ)। কোন কোন কৃতবিদ্য ও নাট্যরসিক ধনী নিজেরাও নাটক রচনা করতে লাগলেন—যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি।

এই সময়ে যে কয়েকটি সৌখীন সম্প্রদায় নাট্যজগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল, সেগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া নাট্যশালা, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়, শোভাবাজার রাজবাড়ীর প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি, ঠাকুরবাড়ীর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা এবং বলদেব ধর ও চুণিলাল বসুর বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়। বাঙালী নাট্যকারদের মনে তারা প্রাথমিক প্রেরণা জুগিয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই জীবন হয়েছিল স্বল্পকালস্থায়ী। তখনকার প্রধান নাট্যকার রামনারায়ণের নাটকাবলী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে অভিনীত হ'ত। রামনারায়ণের "রত্নাবলী"

নাটকের অভিনয় দেখেই গোঁড়া ইংরেজীনবিস মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় নাটক রচনা করবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই : বর্ত্তমান কালে বাংলা দেশে সাহিত্যজগতের উচ্চতর শ্রেণীর লেখকরা সাধারণত নাট্যজগতে দেখা দেবার জন্যে বিশেষ আগ্রহপ্রকাশ করেন না বটে, কিন্তু বাংলা সাহিত্য মধুসূদনের বিপুল প্রতিভাকে লাভ করেছে নাট্যজগতের ভিতর দিয়েই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন যখন "শর্ম্মিষ্ঠা" রচনায় নিযুক্ত হন, তখনও পর্য্যন্ত তাঁর লেখনী মাতৃভাষায় একটিমাত্র পংক্তিও প্রসব করেনি—অথচ জীবনের তিন ভাগের দুই ভাগ তিনি পার হয়ে এসেছেন। কোন নটের অনুরোধে তিনি যে লেখনী ধারণ করেননি, মাতৃভাষায় আধুনিক মৌলিক নাটকের অভাব দেখেই যে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, "শর্ম্মিষ্ঠা"র প্রস্তাবনার গানটির মধ্যেই সে প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। যথা—"শুনগো ভারত-ভূমি,

কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম-ঘোর,
হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথা বাল্মীকি, ব্যাস,
কোথা কবি কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য-রঙ্গে,
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

প্রভৃতি

মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" ও "পদ্মাবতী" নাটক বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্যে লিখিত হয় নি, কারণ রচনার বহুকাল পরে ঐ পালা দুটি বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল। এথেকে বেশ বোঝা যায়, ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে বা কোন রঙ্গালয়ের তাগিদে তিনি নাটক রচনা করতেন না, মাতৃভাষার অভাব পূরণ করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। জীবনসন্ধ্যায় রোগশয্যায় প'ড়ে অগ্রিম মূল্য নিয়ে একবার মাত্র তিনি নাটক ("মায়াকানন") রচনায় বাধ্য হয়েছিলেন।

এই সময়েই স্বাধীন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর লিখিত সাতখানি নাটকের কোনখানিই কোন রঙ্গালয়ের জন্যে লিখিত হয় নি। পরে অবশ্য তাঁর নাটকগুলি বহু সাধারণ ও সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনীত হয়েছিল। বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়ের মধ্যস্থতায় সে যুগের আর একজন প্রধান নাট্যকার আত্মপ্রকাশ করেন—মনোমোহন বসু। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও কয়েকখানি নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু মাইকেল, দীনবন্ধু, মনোমোহন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে আমি "প্লে-রাইট" ব'লে মনে করি না, তাঁরা ছিলেন "ড্রামাটিষ্ট", দেশে রঙ্গালয়ের অস্তিত্ব না থাকলেও তাঁরা হয়তো নিজেদের নাটক রচনার প্রেরণা দমন করতে পারতেন না।

আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে তাই। যাঁরা বলেন, শিশিরকুমার বা অন্য কোন প্রতিভাবান অভিনেতার অবহেলাই যুগোপযোগী প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের অভাবের জন্যে দায়ী, তাঁরা হচ্ছেন ভ্রান্ত। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কোনদিনই কোন রঙ্গালয় বা অভিনেতার মুখ চেয়ে লেখনীধারণ করেন না, নিজেদের আন্তরিক ইচ্ছাই তাঁদের নাটক রচনায় প্রণোদিত করে। ফুল-ফলের গাছ মালীর মুখ তাকায় না, তারা ফুল-ফলের ফসল ফলায় গহন বনে সকলের অগোচরেই। সত্যিকার কবি ও নাট্যকাররাও

হচ্ছেন ঐরকম। কেউ উৎসাহ দিয়ে বা লোভ দেখিয়ে বা জোর ক'রে নাট্যকার তৈরি করতে পারে না। এ দেশেই এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণের অভাব নেই।

আমরা দেখিয়েছি যে, কোন নট বা নাট্যসম্প্রদায়কে দেখে মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু নাটক রচনা করবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেননি। তখনকার বাংলা সাহিত্যে নাটকের দৈন্য দেখেই তাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন। "The Three Unpleasant Plays"-এর ভূমিকায় বিখ্যাত নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক বার্নার্ড স স্পষ্টই বলেছেন: "রঙ্গালয় নাটককে গঠন করে না, নাটকই গঠন করে রঙ্গালয়কে। * * * * আজকাল নিজের ভিতরকার তাগিদে নাটক রচিত হয় না, রচিত হয় রঙ্গালয়ের তাগিদে। যা কিছু মুস্কিল ঐখানেই।"

ধরুন আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথা। তিনি কেবল একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও কথা-সাহিত্যিক নন, তিনি বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। কিন্তু তিনি কোনদিনই বাংলা রঙ্গালয়ের দিকে আকৃষ্ট হননি, অথচ নিজের মনের ভিতর থেকে প্রেরণা পেয়ে রচনা করেছেন নাটকের পর নাটক। তাঁর কয়েকখানি নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকদের পক্ষে যথেষ্ট গুরুপাক ব'লে সেখানে অভিনীত হ'তে পারেনি। কিন্তু তাঁর অন্য শ্রেণীর কয়েকখানি নাটক আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়েও জনপ্রিয় হবার সুযোগ পেয়েছে।

প্রধানত মাইকেল ও দীনবন্ধুকে অবলম্বন ক'রেই বাংলা দেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের পত্তন হয়েছিল। তারপর যখন আর কোন শক্তিধর নাট্যকার আত্মপ্রকাশ করলেন না, তখন আমাদের রঙ্গালয় বাধ্য হয়েই অবলম্বন করলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রও কালক্রমে পুরাতন হয়ে উঠলেন। তবু শক্তিশালী নূতন নাট্যকারের

দেখা নেই। ব্যাপারটা আপনারা একটুখানি তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করুন। বাংলা সাহিত্যজগতে যখন বহু ক্ষমতাশালী লেখকের অভাব নেই এবং বাংলা নাট্যজগতে যখন গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু ও অমৃতলাল বসু প্রভৃতির মত প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারা সগৌরবে বিরাজমান, তখনও কোন বিখ্যাত লেখনী নাটক রচনার জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করেনি। কেবল তাই নয়। বাংলা রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা নতুন নাটকের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা ক'রে বিজ্ঞাপনও দিতে লাগলেন, তবু কোন লেখক প্রলুব্ধ হ'লেন না। বার্নার্ড স খাঁটি কথাই বলেছেন: "রঙ্গালয় নাটক গঠন করে না।"

এই অচল অবস্থা দেখে গিরিশচন্দ্র শেষটা দায়ে প'ড়ে নাট্যকার হয়ে পড়লেন। তাঁর নিজের উক্তি এই: "সত্যি বলছি আমার dramatist হবার কোনও কালে ambition ছিল না। * * * * যখন মাইকেল বঙ্কিম প্রায় dramatised করা শেষ হ'ল, ষ্টেজে আর কোনও অভিনয়োপযোগী নাটক মিললো না, তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হ'ল।" কিন্তু রঙ্গালয়ের ও নট-নটীদের মুখ তাকিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি যে নিজের পূর্ণ প্রতিভার প্রসাদ থেকে আমাদের বঞ্চিত ক'রেছেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ক্ষমতা থাকতেও তিনি যে নিজের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে পারছেন না, এটুকু সচেতনতা তাঁরও ছিল। তাঁর অত যত্ন-পরিশ্রমে ভাষান্তরিত, অমন শ্রেষ্ঠ নাটক "ম্যাকবেথ" এখানে জমল না, অথচ অনায়াসে রচিত চুটকি নাটিকা "আবুহোসেন" দেখবার জন্যে দর্শকদের উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা নেই। গিরিশচন্দ্র দুঃখিত হয়ে মত প্রকাশ করলেন—নাটক বুঝতে এখনো এদের বহু বৎসর লাগবে, এদেশে ভালো নাটক বোঝবার লোক নেই। অন্যত্র তিনি বলছেন: "থিয়েটারের অনেক imrovement করবার ও নূতন

নূতন ভাব দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা হয়ে উঠল না। * * * * এই মাথার ভিতর যা ছিল তাই দিয়ে যেতে পারচি না—দেশের লোকের apathy-র জন্য।" আর এক জায়গায় বলছেন: "আমার নূতন ভাবে নাটক লেখবার ইচ্ছে হয়েছে। * * * * ভিতরের দ্বন্দ্ব internal dramatic actions—যা সামান্য স্থূল ভাবে বাহিরে প্রকাশ পায়,সেই internal actions এঁকে দেখানোই best literary art"; বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্রের "নূতন ভাবে নাটক" লিখে "best literary art"এর নমুনা দেবার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। উপরন্তু সেক্সপিয়ারের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিকে বাংলায় ভাষান্তরিত করবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। কিন্তু "ম্যাকবেথে"র দুর্দ্দশা দেখে তিনি সে ইচ্ছাও দমন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আসল কথা, বাংলা নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রকে জীবনযাপন করতে হয়েছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রমিথিউসের মত।

এমন দেশেও কোন কোন অতি-বুদ্ধিমান সমালোচক অভিযোগ করেন,—"শিশিরকুমার কোন প্রতিভাবান নাট্যকার তৈরি করতে পারেননি!" যেন নাট্যকার তৈরি করাই অভিনেতার কাজ! সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেবার পর থেকেই শিশিরকুমার বারংবার নূতন নূতন নাট্যকারের জন্যে পথ ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু একমাত্র যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ছাড়া আর কেউ ধোপে টিকলেন না। এবং সব দিক দিয়ে সুবিধা পেয়েও যোগেশচন্দ্র যদি প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনায় অক্ষম হন, সে দোষ শিশিরকুমারের নয়। আবার যখন তিনি কোন শক্তিশালী নূতন লেখকের যুগোপযোগী নাটক (যেমন "পরিচয়") মঞ্চস্থ করেছেন, জনসাধারণ তখনও সে প্রচেষ্টাকে উচিতমত মর্য্যাদা দেয়নি। আবার সাধারণ রঙ্গালয় যে সব নাটক গ্রহণ করতে সাহসী হয়নি (যেমন ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলমগীর" এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" ও "পাষাণী"),

তাই নিয়ে শিশিরকুমার যে সোনা ফলিয়েছেন, একথা সকলেই জানেন। "রঘুবীর" সম্বন্ধেও প্রায় ঐ কথাই বলা যায়। ওখানিও ছিল অনাদৃত নাটক, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে "রঘুবীর" প্রথম মঞ্চস্থ হয়ে তুই-তিন রাত্রির বেশী চলেনি। বহুকাল পরে শিশিরকুমারই তাকে দেন বলিষ্ঠ নবজীবন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে রচিত (এবং বাংলা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক) "ষোড়শী"র অসাধারণ সাফল্যের প্রধান কারণ হচ্ছে শিশিরকুমারেরই প্রতিভা। শ্রেষ্ঠ নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্যে চিরদিনেই তাঁর বিপুল উৎসাহ এবং উৎসাহের আতিশয্যে তিনি নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করতেও ভয় পাননি। রবীন্দ্রনাথের "তপতী" খুলে "নাট্যমন্দিরে"র দ্বার চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। শিশির-কুমারের প্রাণপণ চেষ্টার অভাব হয়নি, তবু অভাব হয়েছে প্রথম শ্রেণীর নূতন নাট্যকারের এবং নাট্যরসিক জনসাধারণের। আবার বলি, বার্নার্ড সয়ের কথাই সত্য: "রঙ্গালয় নাটক গঠন করে না, নাটকই গঠন করে রঙ্গালয়কে।"

পরিশিষ্ট

এক

শিশিরকুমারের প্রয়োগ-নৈপুণ্য *

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কল্যাণীয়েষু—

কাগজে নিজের জবানীতে অভিনয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তুমি লিখে দিতে পার যে শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার দুই একটা নাটক অভিনয়ের ভার তাঁর হাতে দিয়েছি। সীতা বইটিকে আমি একটুও পছন্দ করিনে—ওটা নাটকই নয়—এই জন্যই এ নাটক অবলম্বন করে' অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখানো কঠিন—তৎসত্বেও শিশিরবাবু নিজের ক্ষমতার জোরে এ বইটিকেও চালিয়ে দিতে পেরেচেন। তুমি আমার কাছ থেকে এ সব কথা শুনেচ বলে লিখতে পার। ইতি ২ ভাদ্র, ১৩৩১

রবিদাদা

---

* "ভারতী" সম্পাদক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লিখিত।

দুই

মনোমোহনে সীতা

(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শুনবেন—গত রবিবারে শিশিরবাবুর মনোমোহন নাট্যমন্দিরে গিয়ে সীতাভিনয় কেমন দেখলেম ?—ভালই দেখলেম—কেননা মন্দ দেখতে পাবো এটা যদি বোধ করতেম তো যেতেমই না, কিন্তু এই যে ভাল দেখলেম শব্দটি হাতের লেখার মধ্যে দিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছচ্ছে এটাতে আমি কতখানি যে ভাল দেখলেম তা বোঝাই তো গেল না ! ঐ কথা দুটো যদি কোন দিনে এখানে এসে আমার মুখে শুনে যেতেন, তবে বুঝতেন কতখানি ভাল লেগেছে সেদিনকার সমস্ত অভিনয়টি ! লেখার মধ্যে বাঁধা পড়লে শুধু যে কথাটা নির্জ্জীব হয়ে যায় তা নয়, অনেক সময় পাঠকের পড়ার দোষে কথাটার উল্টো অর্থ হয়ে পড়ে, সুতরাং "শতং বদ মা লিখ", এটা পণ্ডিতেরা বুঝে-সুঝেই উপদেশ দিয়েছেন, অথচ আপনারা চাচ্ছেন লেখার মধ্যে দিয়ে শুনতে আমার মনের কথা। ভাল, তাই হোক, কেউ উল্টা বুঝলে দায়-দোষ আপনাদের।

সে বছরে আমি আর একদিন কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে গিয়ে আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় শিশিরবাবুর অভিনয় দেখার সুযোগ পেয়েছিলেম। সেবারে দেখেছিলেম শিশিরবাবু একা সমস্ত অভিনয় ব্যাপারটি পরিপূর্ণ করে আছেন, তাঁর সহচর নেই, সমকক্ষ অভিনেতাও নেই, সেবারের রঙ্গমঞ্চে। এবারে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে গিয়ে দেখলেম যে সব অভিনেতা অভিনেত্রীকে শিশিরবাবু নিজের হাতে গড়ে তুলছেন,—আস্তে আস্তে, তাঁরা যাতে তাঁর সমকক্ষতা করতে পারেন, তার কারণে

নিজের অভিনয়পটুতা তিনি ইচ্ছা ক'রেই সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে অন্যের অভিনয়টিকে অনেকখানি ফুটে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছেন। বড় যে, সে ছোটদের কল্যাণ কামনা করে নিজের বৃহৎ আওতা অনেকখানি সরিয়ে নিয়েছে, এটুকু আমার কাছে ভারি নূতন লাগলো। ইতিপূর্ব্বে বাংলার কোন রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা এমন করে নিজেকে একপাশ করে রেখেছেন দেখেছি বলে তো মনে হয় না। যে গড়ছে, সে যদি যাকে গড়লে তাকে আড়াল করে নিজেই এগিয়ে দাঁড়ায়, সে যে নিজেরই পায়ে নিজে কুড়ুল মারে এ কথাটা কেবল যাঁরা সত্যিই রসিক তাঁরা বোঝেন এবং সেই বুঝে কাজও করে চলেন; তথাকথিত রসিক তারা এটা বোঝে না, শুধু মুখে বলে। প্রখর আলোর মতো প্রতিভা যখন সম্পূর্ণ প্রকাশ পেতে চাচ্ছে, তখন কাঁচা অভিনেতা অভিনেত্রীদের খাতিরে তার উপরে আবরণ টেনে রাখতে যে কতখানি ধৈর্য্য এবং শক্তি ব্যয় ক'রতে হয় বড় অভিনেতাকে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ সীতাভিনয়ের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত শিশিরবাবুর চলা-বলার মধ্যে আমি লক্ষ্য করে এসেছি। এক এক সময় তাঁকে দেখে মনে হ'ল বুঝি এবারে বাঁধ ভাঙে মন আর বাগ মানে না। অভিনয় ব্যাপারে যারা নতুন, যারা ছোট তাদের উপরে এই মমতা অত্যন্ত মধুর ঠেকলো আমার কাছে। চারুচন্দ্র নিপুণ চিত্রকর, তিনি দৃশ্যপট সাজগোজ যত্নে রচনা করলেন—অভিনয়কে প্রাধান্য দিতে হ'লে নিশ্চয় দৃশ্যপটগুলিকে অনেকটা পিছনে রাখা দরকার, সেখানেও দেখলেম শিশিরবাবু অনেকটা বড় জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন দয়া করে চারুবাবুকে। প্রথম দৃশ্যেই এটা চোখে পড়লো আমার, তারপর যখন দুর্ম্মুখ প্রবেশ করলেন তখন এটা আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। দুর্ম্মুখকে সাজ-সজ্জায় শিক্ষাদীক্ষায় অভিনয়ের চাতুর্য্যে একেবারে নিখুঁত করে ছেড়ে দিয়েছেন শিশিরবাবু, অথচ নিজের বেলায় তিনি সবদিক দিয়ে

একটুখানি ঢিলে দিয়ে বসে আছেন। রচয়িতাকে অনেকখানি আবরণ করে রচনা বর্ত্তমান হলে যা হয় ঠিক সেইটা হল সেদিনকার রামের পাশে অতি চমৎকার এই দুর্ম্মুখের রচনা। এই দুর্ম্মুখকে যখন আর একটা দৃশ্যে দেখলেম রামের কাছে মণিমালা ভিক্ষে চাচ্ছে, তখন শিশিরবাবুর অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিপূর্ণতা চকিতের মত দেখা দিলে—হিমালয়ের চূড়া থেকে একটুখানি দাক্ষিণ্য যেন ঝরে পড়লো মুক্তা-নির্ঝরের ছলে পায়ের তলায় যে মহারণ্য পড়ে রয়েছে তার দিকে।

কি অভিনয় করার দক্ষতা, কি অভিনয় শিক্ষা দেবার ক্ষমতা দুই দিক দিয়ে শিশিরবাবুর পরিচয় নেবার সৌভাগ্য হয়ে গেল আমার সেদিন, এবং এটার জন্যও তাঁকেই আমার ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে। তিনি যদি নিজের রচনা সীতা, তুঙ্গভদ্রা, দুর্ম্মুখ ইত্যাদি সবাইকে একেবারে নিখুঁৎ-ভাবে তৈরি করে নিয়ে তবে আমাকে ডাকতেন তো একটা মস্ত আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করতেন, এবং তাঁর নিপুণ সৃষ্টিকৌশলের রহস্য ধরবার অবসর আমার অদৃষ্টে ঘটা সম্ভবও হতো না।

প্রথম দৃশ্যের একটি ঘটনা আমার কাছে বড় সুন্দর লাগলো। সীতা যেখানে রামচন্দ্রের কাছ থেকে আশীর্ব্বাদের মতো বনবাস দুঃখ অঞ্জলি ভ'রে গ্রহণ করছেন, এই ছবিখানির মধ্যে আমি যে শুধু রাম-সীতাকে দেখতে পেলেম তা তো নয়, আমি দেখলেম, গুরুর কাছে শিষ্য, বড়র কাছে ছোট নিজের কৃতজ্ঞতার ফুল করপুট ভ'রে নিয়ে এল, নূতন প্রণতি দিলে উত্তম ও নূতনতমকে।

তিন

"সীতা"

(শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বিগত দুই রাত্রি উপর্য্যুপরি ও আদ্যোপান্ত মুগ্ধ হইয়া আমি এই নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ইহার তুলনা নাই। আশ্চর্য্য এই স্বল্পকালের মধ্যে শিশির কি করিয়া না তাঁহার দলের নূতন লোকগুলিকে এমন মানুষ করিয়া তুলিলেন! বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের অভিনয় দেখিবার সময় বহুবারই মনে হইয়াছে এই বাঙ্গলা দেশের সমস্ত অভিনেতাই যে সবিনয়ে ইহাঁর কাছে আপনাদের শিশু বলিয়া মনে করেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এবং সত্য স্বীকার করায় তাঁহাদের গৌরব আছে।

চার

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ শিশিরকুমার ভাদুড়ী

(মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়)

যেদিন প্রথম তোমার 'আবৃত্তি' শুনিয়াছিলাম মনে হইয়াছিল তাদৃশ সুন্দর আবৃত্তি আমি আর কাহারও নিকট শুনি নাই, আমার সে ধারণা আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাহার পরে যেদিন 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে তোমাকে চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করিতে দেখিলাম, সেদিন মুগ্ধ হইলাম, ভাবিলাম, অভিনয়-কলা কেবল প্রতীচীরই নিজস্ব নহে, প্রাচীদিকবাসীও চেষ্টা করিলে উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখাইতে পারে, আলমগীরের ভূমিকায় তোমার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর রচিত 'সীতা' নাটকের অভিনয় যখন আরম্ভ হইল, আমার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে সেই অভিনয়ের প্রশংসা শুনিয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল আমার বন্ধুগণ তোমার প্রাপ্য যশের পূর্ণভাগ তোমাকে দেন নাই, কার্পণ্য করিয়াছেন; রামের ভূমিকায় যাহা তুমি দেখাইয়াছ, তাহা যথার্থই মনোমুগ্ধকর; অভিনয়-কালে তোমার হস্ত-পদাদির চেষ্টা, নাটকের ভাবানুযায়ী মুখ-চক্ষুর ভঙ্গী, অপর পাত্র পাত্রীগণের কথোপকথন সময়ে তোমার মূক অভিনয়, এসমস্তই অপূর্ব্বসুন্দর ও দর্শকের চিত্তহারী। বাঙ্গলার সমস্ত রঙ্গমঞ্চে যেদিন তোমার ন্যায় কলানিপুণ অভিনেতৃগণের আবির্ভাব হইবে সেদিন রঙ্গমঞ্চ আনন্দ ও শিক্ষার গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে পরিণত হইবে।

মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে নারায়ণের অবতার বলিয়া রামায়ণে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নরদেহধারী রামকে কায়মনোবাক্যে নরের ন্যায়ই অঙ্কিত করিয়াছেন; সুখ-দুঃখে মিলন-বিরহে রামচন্দ্রকে মানুষের আচরণে ব্রতী করিয়াছেন। দশানন কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে রামচন্দ্রের বিলাপোক্তিতে সমস্ত কাননভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। শারদাগমে সীতাবিরহে রামচন্দ্র আর্ত্তরবে কাঁদিয়া উঠিয়াছেন। ভবভূতির রামচন্দ্রও তদ্রূপই অঙ্কিত; যদিও তিনি 'স্নেহং সৌখ্যঞ্চ দয়াঞ্চ যদি বা জানকীমপি। আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥" বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন তথাপি সীতাবিরহিত রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে সীতাকে স্মরণ করিয়া মানবের ন্যায়ই পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন; যদিও ভবভূতি "অনির্ভিন্নগভীরতাদস্য গূঢ়ঘনব্যথঃ। পুটপাক প্রতিকাশো রামস্য করুণোরসঃ॥" বলিয়াছেন, কিন্তু জনস্থানে সে উপুট পাক-পাত্র উদ্বেলিত হইয়া রামের করুণরসে বনভূমি প্লাবিত হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু ভবভূতির ভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন মনে হয়; অনেকগুলি কথাও যেন উত্তর-রামচরিতের সংস্কৃত কথার ভাবান্তর, গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার নাটকে রামচন্দ্রকে সীতাবিরহে অতিমাত্র কাতর করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, তোমার অভিনয়ের মধ্য দিয়া রামের সেই মানবোচিত বিরহ কাতরতা সুসঙ্গতরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের ভাষা বিষয়ের অনুরূপ, তাই কেবল অভিনয়-কালে নহে, নাটকখানি পাঠ করিবার সময়েও পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। যোগেশবাবু তাঁহার "নিবেদনে" বলিয়াছেন, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার জন্য নাটক রচনার উদ্যম তাঁহার এই প্রথম, আমার মনে হয় যোগেশবাবুর ভবিষ্যৎ উদ্যমগুলি সর্ব্বপ্রকারে জয়যুক্ত হইবে।

রঙ্গমঞ্চের অভিনব ব্যবস্থা তোমার কল্পনা-কুশলতা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক; নেপথ্য হইতে মঞ্চপ্রবেশের ও তথা হইতে প্রস্থানের নির্দ্দিষ্ট পথ উঠাইয়া দিয়া যে নূতন ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনোরম হইয়াছে।

কদলীবৃক্ষরোপণ, শঙ্খধ্বনি, ধূপধুনা, পুষ্পবৃষ্টি এসমস্তই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং এবং যে কালের ব্যাপারে অভিনয় করিতেছ, সেই কালোপযোগী হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। পাত্রপাত্রীগণের আভরণ পরিচ্ছদ প্রভৃতি সামগ্রীও কালোপযোগী এবং নয়নের তৃপ্তিপ্রদ। অপরাপর পাত্র পাত্রীগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অভিনয়ে উৎকর্ষ সাধনের অবসর রহিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।

তুলনা সর্ব্বথা পরিহার করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজের অন্তরে যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা বলিতে হইলে আমাকে বলিতে হইবে যে তোমার অভিনয়-দক্ষতা যে কোনও দেশের শ্রেষ্ঠতম অভিনেতৃগণের দক্ষতার সমতুল্য; আমাদের দেশে তোমা অপেক্ষা অভিনয়কুশলী নট আমি দেখি নাই। আশীর্ব্বাদ করি তুমি রঙ্গমঞ্চের উৎকর্ষসাধন-ব্রতে সফলকাম হও এবং অভিনয় দর্শনার্থিগণের চিত্তে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি তোমার অভিনয় দর্শনে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকুক।

পাঁচ

মনোমোহন নাট্যমন্দিরে "সীতা"

(দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ)

আমি আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম যে শ্রীমান শিশিরকুমার ভাদুড়ী জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম। আজ আমি রামের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা অতি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। রামের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় অপূর্ব্ব হইয়াছে।

আমি পূর্ব্বে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে সকল অভিনয় দেখিয়াছি সে অভিনয়ে অপ্রধান চরিত্রগুলি কোনও দিনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু শিশিরকুমারের সম্প্রদায়ের এই অভিনয়ের অপ্রধান অংশগুলির অধিকাংশই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

সীতার চরিত্রে যে অভিনেত্রী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন শিশিরকুমারের সহিত তুলনায় তাঁহার অভিনয় অনেক নিরেশ হইলেও সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের তুলনায় তাঁহার অভিনয় শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর হইয়াছে।

মোটের উপর অভিনয় আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে আমার শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অভুক্ত অবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ফিরিতে পারি নাই।

ছয়

"অমৃত-ভাষণ"

(নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু)

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে নাট্যকলা অত্যন্ত হীন হ'য়ে প'ড়েছিল। সারা জীবন ধ'রে আমি এই কলার সাধনা ক'রে এসেছি, শেষে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে নাট্যকলার এই অবনতি দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল। কিন্তু আজ যাঁরা বাংলার নাট্যশিল্পে নবযুগ এনেছেন—আর্ট থিয়েটারে যাঁরা অভিনয় করছেন এবং বিশেষ ক'রে শিশিরবাবুই এই নবযুগের প্রবর্ত্তক। যে ব্যথা নিয়ে আমায় ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল, সে বেদনা থেকে এঁরা আমায় মুক্তি দিয়েছেন। যাদের সঙ্গে একসঙ্গে আমি এই কাজে নেমেছিলুম, তারা একে একে সকলেই এই সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে—আমি ভাবছিলুম, ঈশ্বর কি আমাকে রঙ্গালয়ের এই হীন অবস্থা দেখবার জন্যই জীবিত রেখেছেন! কিন্তু আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি এঁরা আমায় সে আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

সাত

নাট্যমন্দিরে "সীতা"

(রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

গত ৭ই ভাদ্র শনিবার মনোমোহন নাট্যমন্দিরে "সীতা" দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রায় ২০।২২ বৎসর গত হইল, ব্যবসায়ী থিয়েটার দেখি নাই, অনেকের মুখে "সীতা" অভিনয়ের কথা শুনিয়া দেখিতে গিয়া বুঝিলাম, যদি না যাইতাম নয়ন-মনকে বঞ্চিত করা হইত। দেওয়ান বাহাদুর ডাক্তার হীরালাল বাবু, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বসু ও আমি আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে বসিয়াছিলাম, আত্যন্ত অশ্রুধারে ভাসিয়াছিলাম। এই পরিণত বয়সে মনে হয়,—বাঙ্গলার নাট্যমন্দিরে এমন-ই ভাবে কেন অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয় না? "সীতা"র—রাম, সীতা, লব ও তুঙ্গভদ্রার তুলনা নাই, কথার চেয়েও নীরব দৃষ্টিতে, উচ্ছ্বাসের কম্পনে যে ভাব ও রসের স্ফূর্ত্তি কত অনুপম অপূর্ব্ব হইতে পারে তাহা এতকাল অলঙ্কার-শাস্ত্রে পড়িয়াছি ও পড়াইতেছি, কিন্তু সেইদিন প্রকৃত-প্রস্তাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, এ কথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বাল্মীকির অভিনয় দর্শনে সহজে অবাক হইলাম। আর্য্য-ভাবের অভিব্যক্তি মানুষের দ্বারা এর চেয়ে উত্তম হইতেই পারে না। বায়স্কোপের এই মহামারির দিনে আমাদের মেয়েরা যদি এই সকল পৌরাণিক অভিনয় দেখেন,—ধ্রুব বিশ্বাস, তাঁদের পুরাণের গল্প আর পুরান বলিয়া মনে হইবে না, পক্ষান্তরে পরোক্ষভাব বিপন্ন বাঙ্গালীর সমাজের বাতাস পরিবর্ত্তিত হইবে।

রাম ও সীতার অভিনয় দর্শনের সময় মধ্যে মধ্যে ভাবিতেছিলাম,

ভারতবর্ষ দিন দিন কতবড় সম্পদ হইতে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে, কতবড় আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে! সীতা যে সত্যিকার একজন মানুষের দ্বারা এমনভাবে অভিনীত হইতে পারে, তাহা ইহার পূর্ব্বে জানিতাম না। স্বয়ং শিশিরকুমার রামের ভূমিকায় দর্শকগণের চিত্তে একটা বিষাদের একটা স্থায়ী ছাপ আঁকিয়া দিয়াছেন। যখন নির্ব্বাসিতা সীতার পুত্র লবের কণ্ঠস্বর শ্রবণে চমকিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া রাম অবশভাবে ভরতকে জড়াইয়া ধরিলেন, তখন অতিবড় পাষাণেরও বুক ফাটিয়া গিয়াছিল, মহিলামণ্ডলীর মধ্যে রোদনের রোল পর্য্যন্ত শোনা গিয়াছিল। এত সুন্দর অভিনয়ের অবতারণা ও প্রচলন করিয়া শিশির-কুমার বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এখন বুঝিতেছি যে,—কেন একক্রমে ৪।৫ ঘণ্টাকাল কবিবর রবীন্দ্রনাথ বিমুগ্ধপ্রাণে বসিয়া সেদিন সীতার অভিনয় দেখিয়াছিলেন।

সাজ-সজ্জার নির্ম্মাণে ও নির্ব্বাচনে শিশিরকুমার ভারতের সনাতন ও নয়নরঞ্জন প্রাচীন পরিচ্ছদ-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া অভিনয়-কলার সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। নৃত্য-দর্শনের সময়ে ভাবিতেছিলাম, কি করিয়া সেই প্রাচীন যুগের কপোতহস্তিকা, দ্বিপাদিকা প্রভৃতি ভারত-নাট্যসূত্রের নৃত্যাদি সমূহ ইহাঁরা অভ্যাস করাইলেন! সারা অভিনয়টির মধ্যে (জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে) একটা প্রাচীনত্বের ছায়া আদ্যোপান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে; নবীন পাত্রগণের দ্বারা অতি প্রাচীন ভাব এত সুন্দর করিয়া করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শিশিরকুমারকে শত শত ধন্যবাদ।

নাট্যালয়ে বাঙ্গালীর গৌরব শিশিরকুমারের সবই খাঁটি বাংলার জিনিষ। এ, বি, সি, ডির বদলে ক, খ, গ, ঘ চিহ্নিত দরজা। প্রত্যেকের পৃথক আসন। বিলাতী কনসার্টের বদলে সেই প্রাণমাতানো দেশী রোসনচৌকি সমস্তই চোখ বুজিয়া উপভোগের বিষয়।

আট

"আলমগীর" ও শিশিরকুমার

(শ্রীদিলীপকুমার রায়)

মাসাধিককাল আগে আলমগীরে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হওয়া অবধি তাঁর কলাকারু সম্বন্ধে দুচারটা কথা অনাড়ম্বরভাবে লেখার ইচ্ছে জন্মেছিল। অভিনয়-কলা সম্বন্ধে যে আজ লিখতে সাহসী হয়েছি, তা এই ভেবে যে, আমাদের দেশে শিল্পকলা সুধীজনসমাজে বস্তুতঃ এত অবজ্ঞাত যে সে সম্বন্ধে প্রত্যেক আন্তরিক তারিফ প্রচারেরই একটা কম-বেশী মূল্য আছে। য়ুরোপে—যেখানে specialisationএর প্রতাপ বড়ই বেশী—সেখানে এরূপ dilettante আলোচনার তত দরকার থাকে না—(যদিও তা সত্ত্বেও এর দাম যে সেখানেও একেবারে নেই তা জোর করে বলা যায় না)। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক দেশে বিশেষ করে শিল্পকলা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা শুধু যে পুণ্যবানে শোনে না তাই নয়, জ্ঞানবানেও করা অনুচিত মনে করে।

অথচ শিশিরকুমারের আলমগীর অভিনয় এতই অপূর্ব্ব হয়েছে যে তাতে মাদৃশ অ-বিশেষজ্ঞও দু-চারটে কথা না বলে থাকতে পারছে না।

কাল এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি শিশিরকুমারের আলমগীর অভিনয় দেখেন-নি। তাঁর এক বিলাত-ফেরত আত্মীয় তাঁকে বলেছেন যে, শিশিরকুমারের অভিনয় সুন্দর হয়েছে বটে, কিন্তু তবু বিলাতের অভিনয়ের মতন হয়-নি।

কথাটা শুনে একটু হাসিও পেল, দুঃখও হ'ল; সেটা এই কথা ভেবে যে, বিলাত সম্বন্ধে এরূপ অভ্রভেদী ধারণা আমাদের শিক্ষিত সমাজের

মন থেকে দূর হ'তে এখনও অনেক দেরি। বস্তুতঃ আমাদের বিচিত্র মন-বস্তুটি কেমন যেন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না যে, "বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনার রূপোর নয়,—" এখানে আমাকে যেন ভুল বোঝা না হয়। বিলেতের লোকের অনেক মহৎ গুণ আছে এ কথা অস্বীকার করা আমার অভিপ্রায় নয়, বা সে-সব দেশের গুণকে ছোট প্রতিপন্ন করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাই বলে যে তাদের আমরা কোনও মতেই ধর্ত্তে ছুঁতে পারব না, এ কথা স্বীকার করতে আমি রাজি নই—যদিও এরূপ ধারণা আমাদের মধ্যে অনেকেরই যেন মগ্নচৈতন্যে (Subconscious mind) শিকড় গেঁথে আছে বলে মনে হয়। যেমন কাউকে কাউকে আমি বলতে শুনেছি যে, শ্বেতচর্ম্মের মত Punctuality গুণটি আয়ত্ত করা আমাদের সাধ্যাতীত বা তাদের মতন নিয়মানুগত্য discipline আমাদের ধাতেই সইতে পারে না। কিন্তু মত প্রকাশের সময় যদি একটু ভেবে দেখতে চেষ্টা করা যায় তাহলে দেখা যায় যে, কোনও জাতির মধ্যে এরকম গুণের আদর বাড়ানো নির্ভর করে—এ সব বিষয়ে তাদের traditionএর উপর—তাদের কোনও অতি-মানুষ-সুলভ ক্ষমতার উপর নয়। আমাদের এই আত্মপ্রত্যয়টা অর্জ্জন করা দরকার যে, এ tradition আমরাও গড়ে তুলতে পারি, এবং যেদিন এতে কৃতকার্য্য হব সেইদিনই আমরা বাইরনের মতন হঠাৎ একদিন উঠে দেখব যে, আমরা প্রখ্যাতকীর্ত্তি হয়ে পড়েছি। বিশেষতঃ ললিত-কলায় ওরূপ প্রায়ই ঘটে দেখা যায়, যেমন জার্ম্মানিতে ইতালীয় অপেরার tradition গড়ে ওঠার পর Wagner প্রমুখ সঙ্গীতকারদের অপেরার ক্ষেত্রে ঘটেছিল, বা ইতালীর Renaissanceএর tradition স্পেনে শিকড় নেওয়ার পর Velasquez প্রমুখ শিল্পীর চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে হয়েছিল, বা ফরাসী সারা বার্ণাডের অভিনয়ের tradition ইতালীতে

অঙ্কুরিত হওয়ার পর Elenora Duse প্রমুখ ইতালীয় অভিনেত্রীর শিল্পচাতুর্য্যের ক্ষেত্রে হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি; সুতরাং কোনও দেশে কোনও শিল্পীর বিকাশ সাধন কর্ত্তে হলে আসল দরকার হচ্ছে সে শিল্পের একটী মহৎ tradition গড়ে তোলা।

আমার মনে হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে শিশিরকুমার অভিনয় কলায় এই মহৎ traditionটিকে গড়ে তুলেছেন—অন্ততঃ গড়ে তুলবার পক্ষে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। সেজন্য প্রত্যেক কলানুরাগীরই শিশির-কুমারের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

শিশিরকুমার আলমগীরের ভূমিকায় ভারতীয় অভিনয়-কলার এতই উৎকর্ষ সাধন করেছেন যে আমার মনে হয় যে ইংলণ্ডের কোনও অভি-নেতার চেয়েই কৃতিত্ব তাঁর কম নয়—যদি এঁদের তুলনায় শিশিরকুমারের handicap (সুযোগাভাব) গুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখা যায়।

তবে, একে বিলেত দেশ—(যে দেশের লোক জুতোর দোকানে আমাদের জুতো পরিয়ে দেবে ভাবলেও আমাদের মন এক সময় অবিশ্বাস ও সংশয়দোলায় দোদুল্যমান হ'ত) তার ওপর সাহেব, তার ওপর ইংরেজীভাষী, তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেশী শিশিরকুমারের তুলনা (যখন তার ওপর আবার তিনি বিলাত-ফেরতও নহেন)?—একথা ভাবলে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে! যেমন পূর্ব্বোক্ত ভদ্রমহিলার হয়েছিল, অনেক দিনের hypnotism একদিনে দূর করা কঠিন।

তবে, আমি সাধারণকে আরও একটু shock করে দিতে আজ কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। ইংরেজের চেয়ে ফরাসীরা শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (এ শুধু আমার মত নয়, ভারতীয়দের মধ্যে অভিনয় কলার প্রায় একমেবাদ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ সমালোচক সাহিদ সুরওয়ার্দ্দি অপিচ অন্যান্য যুরোপীয়দেরও

এই মত) এবং ফরাসীদের চেয়ে রুসজাতি শ্রেষ্ঠ। ইতালীয় অভিনয় আমি দেখিনি, কিন্তু বার্লিনে বন্ধুবর সুরওয়ার্দ্দীর কাছে শুনেছি যে ইতালীয়ানরাও নাকি অভিনয়-দক্ষতায় ইংরেজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কাজেই অভিনয়-কলায় বর্ত্তমান সময়ে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ অভিনেতার স্থানও শিশির-কুমারের চেয়ে উচ্চ নয়, একথা বললেও যাঁরা নিখিল য়ুরোপের শিল্প-কলার খবর রাখেন তাঁরা খুব impressed হবেন না।

আমি বলতে চাই যে, ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান ও রুষ এই কয় জাতির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো এবং আমার মনে হয় যে, বিখ্যাত রুষ অভিনেতা কাচালভ (Katchalov) ছাড়া আর কোনও অভিনেতাকেই আমি শিশিরকুমারের চেয়ে বড় অভিনেতা বলে মনে করি না। তবে আমার মনে হয় যে, শিশিরকুমার যদি একবার ফরাসীদেশ ও রুষদেশে সুরওয়ার্দ্দির মতন এ বিষয়ে আরও একটু জ্ঞান সঞ্চয় করতে যান তাহলে কাচালভের সমকক্ষ হওয়াও তাঁর সাধ্যাতীত নয়। কেন নয়, তার কারণ একটু বলা ভাল।

শিশিরকুমারের 'চাণক্য' অভিনয় দেখে মদীয় ৺পিতৃদেব (স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) মুগ্ধ হয়েছিলেন মনে আছে। আলমগীরে কিন্তু শিশিরকুমার সে 'চাণক্য'কে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে এসেছেন (যদিও আমি তাঁর এখনকার 'চাণক্য' অভিনয় দেখিনি)। তাই আমার মনে হয় যে, শত অসুবিধা ও অস্মদ্দেশীয় অ-সমজদারদের হীনরুচির মাঝখানেও যিনি আমাদের অভিনয়-কলার সুর এমনভাবে বদলে দিতে পারেন—তিনি যে সুযোগ পেলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রুষ অভিনেতারও সমান হ'তে পারবেন এটা আশা করা বোধ হয় আকাশকুসুম নয়। য়ুরোপে অভিনয়ের standard আমাদের চেয়ে অনেক উঁচু—বিশেষতঃ

ফরাসী ও রুষ অভিনয়। তাই সে tradition এর সাহায্যে সে সব দেশে যত সহজে অভিনয়কলার উৎকর্ষ সাধন করা যায় (কারণ সাধারণের মধ্যে উচ্চশিল্পে রুচির বিকাশ না হ'লে শিল্পকলার উচ্চতা বজায় রাখা যে কত দুরূহ তা শিল্পী মাত্রেই জানেন), আমাদের দেশে তদভাবে অভিনয়-কলার সে উৎকর্ষ সাধন শতগুণে বেশী কঠিন।

সেইজন্যই শিশিরকুমারের আলমগীর অভিনয় দেখে জনৈক বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক সম্বন্ধে একজন বড় সমালোচকের ছোট্ট সমালোচনাটি মনে পড়েছিলো :—Boy's ! here is a genius at last, take off your hats.

বস্তুতঃ শিশিরকুমারের অভিনয়-নৈপুণ্য দেখে মনে হ'ল যে, এখানে আর যাই থাকুক না কেন ফাঁকি নেই। কারণ আলমগীরের মতন "ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া"রূপ অসাধ্য সাধন কর্ত্তেও যিনি সাহস করেন ও তাতে কৃতকার্য্য না হ'লেও (কারণ এতে কৃতকার্য্য হওয়ার চেয়ে অসম্ভব কাজ এ মরজগতে বোধ হয় আর নেই) আংশিক ভাবেও সফলতা লাভ করেন, তাঁর প্রতিভার সামনে মাথা নীচু না করেই উপায় নেই ! তবে আলমগীর নাটকখানি সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় তাই শিশিরকুমারের সম্বন্ধে মাত্র আর দু একটি কথা বলেই আজ ক্ষান্ত হবো।

শিশিরকুমারের অভিনয় অসম্ভব ভাল হওয়ার দরুণ একটা মুস্কিল হ'ল ঐ যে, আলমগীরে অন্য কোন অভিনয় চোখেই পড়ল না। এইজন্য প্রতিভার পাশে দাঁড়ানোটা হচ্ছে, যাকে ইংরাজীতে বলা যেতে পারে thankless task.

শিশিরকুমার আজ অভিনয়-কলার এমন একটা স্থলে পৌঁছেচেন যেখানে তাঁর প্রতি পদক্ষেপে স্রষ্টার লাস্য-লীলা প্রকট হতে থাকে—

ইংরাজীতে যাকে বলে The hand of a master, অভিনয় বা অন্য শিল্পে ও প্রত্যেক বড় শিল্পীও প্রথম প্রথম ততদিন সন্দিগ্ধচিত্ত থাকতে বাধ্য, যতদিন তাঁর আত্মপ্রত্যয় না জন্মায়। এ আত্মপ্রত্যয় আসে যখন শিল্পী সৃষ্টি করার প্রেরণা পাবার সঙ্গে সঙ্গে techniqueকে হস্তামলকীর মতন আয়ত্ত করেন। এক কাচালভ ছাড়া অভিনয়ের techniqueএ শিশিরকুমারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণপনা অন্য কোন অভিনেতার মধ্যেই অন্ততঃ আমি তো দেখিনি।

প্রতি শিল্পের মধ্যে একটা আবেদন আছে যা উদারহৃদয় শিক্ষিত মানবের কাছে বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে—অবশ্য যদি তাঁদের ও শিল্পীর একটু না একটু চেষ্টা থাকে। তবে এ আবেদন বিশ্বজনীন হয় কেবল প্রথম শ্রেণীর শিল্পের ক্ষেত্রে। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলি। ব্যাপারটা এই যে যদি কেউ বিদেশে গিয়ে কোনও বিদেশী শিল্পের রস গ্রহণ করতে প্রয়াসী হন, তা'হলে দেখা যায় যে, বিদেশী শিল্পের শ্রেষ্ঠতম বিকাশের আবেদনের দাম তার কাছে পনেরো আনা হ'লে সে শিল্পীর দ্বিতীয় শ্রেণীর আবেদনের দাম হ'বে এক আনারও কম। কথাটা ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না। তবে দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় আমার বক্তব্যটি আরও পরিস্ফুট করা যাবে। সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত দিলে দেখা যায় যে, কোনও ভারতীয় সঙ্গীতবিৎ য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ জার্ম্মান সঙ্গীতকার Beethovenএর দাম যদি দেন পনর আনা তবে Mozart-এর দাম দেবেন এক আনা,—যদিও কোনও জার্ম্মান সঙ্গীতবিৎ Beethovenকে Mozart-এর চেয়ে অনুপাতে এত উর্দ্ধে স্থান দেবেন না। তাই আমার বক্তব্যটা এই যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পের আবেদনের দাম থাকলেও, তাতে সাড়া দেয় কেবল স্বদেশের লোক; শিল্পকলার আবেদন বিশ্বজনীন হয় কেবল তখনই, যখন সে শিল্প প্রথম শ্রেণীর হয়—

যেমন সমগ্র য়ুরোপে রুষ অভিনেতা কাচালভ বা ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নাড়ের (অবশ্য আমি তাঁর বৃদ্ধ বয়সের অভিনয় প্যারিসে একবার মাত্র দেখেছিলুম L Armande নামক নাটকে) অভিনয়ের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তেমনি আমার মনে হয় যে, য়ুরোপীয়রা যদি এখানে কারুর অভিনয় হ'তে যথার্থ আনন্দ পায়, তাহলে তারা শিশিরকুমারের মতন অভিনয় হ'তেই সে আনন্দ পাবে।

নয়

"রঘুবীর"

(শ্রীদিলীপকুমার রায়)

"রঘুবীর" দেখতে গিয়ে শিশিরকুমারের অভিনয় দর্শনে দু'চারটে কথা মনে হল—যা না লিখে পারলাম না। শিশিরকুমার যে একজন কত উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা তা যেন সেদিন আমি তাঁর রঘুবীরের অভিনয় দেখে আরও বেশী করে উপলব্ধি করেছিলাম। আমার এক বন্ধু আমাকে একদিন বলেছিলেন যে শিশিরকুমারের এক ভূমিকার অভিনয়ে অনেক সময় অন্য ভূমিকার অভিনয়ের ভাবভঙ্গীর ছায়া পড়ে। এই কথাটির সম্বন্ধে আমার দু'চারটি কথা মনে হয়েছে। সেগুলি আজ একটু বিস্তারিতভাবে লেখা হয়ত অবান্তর হবে না। শিশিরকুমারের বিপক্ষ-দলের লোকের মুখে শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে নানা নিন্দাই শুনেছি! তবে সে সব কথার উত্তর দেওয়ার দরকার কখনও বোধ করিনি, যেহেতু দ্বেষ-প্রসূত নিন্দার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাই হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। তবে আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি শিশিরকুমারের বিপক্ষদলের লোক নন।—তিনি একজন বোদ্ধা উচ্চশিক্ষিত যুবক। তাই তাঁর সমালোচনাটি আমি মন দিয়ে শুনেছিলামও এবং তাই ও-সম্বন্ধে আমার দু'চারটি কথা মনে হয়েছে তা বলা হয়ত নিষ্প্রয়োজন না হতেও পারে।

শুধু শিল্পীর নয়, প্রতি মানুষেরই চলা-ফেরা, ভাব-চিন্তা, লিখন-প্রণালী, ধরন-ধারন, কথার ভঙ্গী, গলার স্বর, উচ্চারণের ঝোঁক—সবেরই একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের নামই Style; এ Styleটা গড়ে উঠতে সময় লাগে। তবে সময়ের অতিপাতের সঙ্গে সঙ্গে যখন

শেষে গড়ে ওঠে তখন সেটা স্থায়ীই হ'য়ে পড়ে। এটা খুবই জানা কথা। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই আচরণের যে একটা প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য থাকে, সেটা একমাত্র সেই মানুষেরই বৈশিষ্ট্য, সেটা একটু ভেবে দেখলে বোধ হয় কেহই অস্বীকার করবেন না। তবে গোল বাধে তখন, যখন অভিনয় বা সঙ্গীত কলার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি বেশী করে ফুটে ওঠে! বলা বাহুল্য কাব্য বা সাহিত্যের মধ্যেও বৈশিষ্ট্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে না উঠেই পারে না—তবে সঙ্গীত, অভিনয় বা বক্তৃতা রূপে আর্টের মধ্য দিয়ে শিল্পীর বৈশিষ্ট্য, Styleটা আমাদের যেন একটু বেশী করেই চোখে পড়ে। কেন না এসব শিল্পের আবেদনের সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্বন্ধ বেশী Immediate ; তাই এই সব শিল্পের Style-এর যে আবেদন সেটা সাহিত্য, চিত্রকলার আবেদনের চেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ।

এই কথাটি আমরা বিশেষ করে অভিনয়-শিল্পের Style-এর সমালোচনা করবার সময় প্রায়ই কম বেশী ভুলে যাই। অর্থাৎ কোনও কবি বা সাহিত্যিকের যে একটা বিশিষ্ট Style থাকতে বাধ্য, সেটা আমাদের ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না বলেই তা থেকে প্রমাণ হয় না যে এঁদের নিজের নিজের একটা বিশিষ্ট Style নেই। প্রত্যেক মানুষের হাসি, ওষ্ঠকম্পন, চক্ষুকুঞ্চন প্রভৃতি সবেরই যখন একটা Style না থেকেই পারে না, তখন লিখার বা অভিনয়ের ভঙ্গীর ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট Style গড়ে না ওঠাই তো অস্বাভাবিক। তাই যদি কোনও অভিনেতাকে বলা যায় যে তাঁর অভিনয়ের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে, তাহলে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, যে লোকটা মিথ্যা কথা না বললেও অত্যন্ত জানা কথা এমনভাবে বলছে যেন সেটা দৈববাণী।

সুতরাং যেটা আক্ষেপের বিষয় সেটা অভিনেতার বা বক্তার প্রকাশ ভঙ্গীর একটা Peculiar Style থাকা নয়—যেহেতু এটা ত না হয়েই

পারে না—আক্ষেপের বিষয় হয় তখনই, যখন সব বিষয়েই তাঁর প্রকাশ ভঙ্গীটা বক্তব্য-বিষয়কে একই ভাবে পরিস্ফুট করে তোলার চেষ্টা করে। এখানেই সামান্য ও অসামান্য অভিনেতার মধ্যে তফাৎ। কে না জানে যে একজন সামান্য অভিনেতাও একটা ভূমিকা প্রায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে অভিনয় করতে পারেন—কিন্তু তারপর সবই একঘেয়ে হ'য়ে দাঁড়ায়। এই একঘেয়ে হবার মনস্তত্ব হচ্ছে এই যে, সামান্য অভিনেতার বলবার থাকে বড়ই কম। এ-কথা সব শিল্প সম্বন্ধেই খাটে। ম্যাথিউ আর্ণল্ড বলেছেন Gray যদিও দু'চারটি কবিতা ভাল লিখেছেন তাহলেও তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলা চলে না, এই জন্য যে, তাঁর বলবার বেশী ছিল না। কিন্তু Shelley এত বড়, কেননা God's Plenty তাঁর মধ্যে মহান গরিমায় বিরাজমান।

শিশিরকুমারের সম্বন্ধেও সেদিন রঘুবীর অভিনয় দেখতে দেখতে আমার এই কথাটাই বিশেষ করে মনে হয়েছিল। অর্থাৎ God's Plenty তার মধ্যে বিরাজমান। শিশিরকুমারের অনুরাগী আমার সে বন্ধুটিও নিশ্চয় তাঁর রঘুবীর অভিনয় দেখলে আমার সঙ্গে একমত হবেন। কারণ শিশিরকুমার রঘুবীরের ভূমিকাভিনয়ে যে জিনিষটি ফুটিয়ে তুলে-ছিলেন সেটা তাঁর রাম, আলমগীর, ইন্দ্র বা চাণক্য ভূমিকার অভিনয়ের প্রকাশভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি রঘুবীরের ভূমিকায় প্রথমে উদ্বেল দ্বন্দ্বকে শান্ত করবার চেষ্টায় সময় যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন সেটাও যেমন কলাকারুসঙ্গত (artistic), শেষে প্রতিহিংসার বাধাবন্ধন ছেদনের অসংযমের প্রকাশের ভঙ্গীটিও তেমনি অশান্ত। যে শিল্পী, আলমগীর, রাম, চাণক্য, ও রঘুবীর এই চার রকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির ভূমিকা প্রায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে অভিনয় কর্ত্তে পারেন, তাঁর Style এর বিরুদ্ধে আর যাই বলা যাক না কেন একঘেয়েত্বের অভিযোগ দেওয়া চলে না।

আমার মনে হয় শিশিরকুমার যে একজন কত বড় প্রতিভাশালী অভিনেতা তা আমাদের অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক গুণগ্রাহীই উপলব্ধি করেছেন, নইলে নানান কাগজে শিশিরকুমারের অভিনয়ের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হওয়াই অসম্ভব হ'ত না কি? কারণ সেগুলি ত দোষদর্শী ও গুণগ্রাহী সমালোচনা নয়, নিছক গালিগালাজ মাত্র। এরূপ সমালোচকগণ একটা কথা প্রায়ই ভুলে যান যে প্রতিভার অসম্মান করার অর্থ—আত্মসম্মানের অস্বীকার করা। কারণ প্রতিভার সম্মান করেই মানুষ নিজের মধ্যে মহত্তম উপাদানকে স্বীকার করে থাকে। "Tell me what you advice and I will tell you all about yourself" কথাটির মধ্যে গভীর সত্য আছে। কারণ মানুষের অনুরাগ ও রুচি তার নিহিত প্রকৃতিকে বড় কম প্রকাশ করে না, তবে প্রকৃত মোহনীয় কিছুর বিকাশকে শ্রদ্ধা করাটা শিক্ষা ও দৃষ্টির প্রসারের উপর নির্ভর করে বলে সঙ্কীর্ণমনাঃ স্বল্পপরিসর-দৃষ্টি মানুষের মনের আনা চিন্তা সচরাচর আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থদ্বেষের গণ্ডীর উপরে উঠতে পারে না।

তবে মহতের ও সুন্দরের প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার বিফলতা না হয়—একটা জাগতিক নিয়ম বলে মেনে নিয়ে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে যে সব গভীর গুণের বিকাশই বিরল। কিন্তু তাই বলে সত্যিকার বড়কে নির্জ্জলা মিথ্যার সাহায্যে ছোট প্রতিপন্ন করবার মতন হীন চেষ্টাকে কোন্ philosophy দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় সেটা ঠাহর করা বোধ হয় একটু কঠিন। বাস্তবিক অনেক সময়ে মনে হয় যে, সত্যিকার আক্ষেপে বিষয় এ সংসারে যদি কিছু থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে—মানুষের এই সব ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, যাকে আঁকড়ে ধরে ক্ষুদ্র-চেতারা মহা উৎসাহে বিরাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শরৎচন্দ্রের অভিনব সাহিত্যের গরিমা বা শিশিরকুমারের মৌলিক অভিনয়

প্রতিভাকে অস্বীকার করা মানুষের মনোজগতের এই শ্রেণীর অসারতারই ছটা দৃষ্টান্ত মাত্র। Carlyle তাঁর Hero worship বইখানিতে লিখেছেন যে "Time makes the Man," কথাটার মতন ভুল কথা জগতে অল্পই আছে, কারণ কত সময়ই না মানুষ শ্রেষ্ঠ জন-নায়ক, চিন্তাবীর, সমাজ সংস্কারক, কবি, শিল্পী ও যুগ-প্রবর্ত্তকের জন্য বিধাতার কাছে নিষ্ফল আবেদন করেছে এবং কত সময়ই না প্রার্থিত প্রতিভার অভাবে বড় বড় আন্দোলন ভূমিসাৎ করছে। তাই যখন অনেক দিন ধরে চাওয়ার ফলে শেষে বিধাতা একজন বড় শিল্পীর সৃষ্টি করেন তখন তাকে অপমান করবার মতন Tragedy আর কি আছে?

দশ

শিল্পাদিত্য শিশিরকুমার

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ইডেন গার্ডেনে একজিবিশনের তাঁবু ছেড়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ি এই সময় মনোমোহনে "সীতা" অভিনয় করছেন, আর সমস্ত কলকাতা বসন্ত-প্রলাপে অশোক-পলাশের মত আনন্দ-উত্তাল হয়ে উঠেছে। কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বাণবিদ্ধ করার দরুন বাল্মীকির কণ্ঠে যে বেদনা উৎসারিত হয়েছিল, শিশিরকুমার তাকে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে বাণীময় করে তুললেন। সমস্ত কলকাতা-শহর ভেঙে পড়ল মনোমোহনে। শুধু অভিনয় দেখে লোকের তৃপ্তি নেই। রাম নয়, তারা শিশিরকুমারকে দেখবে, নরবেশে কে সে দেবতার দেহধারী, তার জয়ধ্বনি করবে, পারে তো পা স্পর্শ করে প্রণাম করবে তাঁকে।

সে সব দিনের "সীতা" জাতীয় মহাঘটনা, দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"য় হস্তক্ষেপ করল প্রতিপক্ষ, কুছ পরোয়া নেই, যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হল নতুন বই। রচনা তো গৌণ, আসল হচ্ছে অভিনয়, দেবতার দুঃখকে মানুষের আয়তনে নিয়ে আসা, কিংবা মানুষের দুঃখকে দেবত্বমণ্ডিত করা, শিশিরকুমারের সে কি ললিতগম্ভীর রূপ, কণ্ঠস্বরে সে কি সুধাতরঙ্গ! কতবার যে "সীতা" দেখেছি তার লেখাজোখা নেই। দেখেছি অথচ মনে হয়নি দেখা হয়েছে। মনে ভাবছি, জন কিটসের মত অতৃপ্ত চোখে তাকিয়ে আছি সেই গ্রীসিয়ান আর্নের দিকে আর বলছি : A thing of Beauty is a joy for ever.

কিন্তু কেবলই কি দু-তিন টাকার ভাঙা সিটে বসে হাততালি দেব, একটিবারও কি যেতে পারব না তাঁর সাজঘরে, তাঁর অন্তরঙ্গতার রংমহলে? যাবে যে, অধিকার কি তোমার? তাঁর অগণন ভক্তের মধ্যে তুমি তো নগণ্যতম। নিজেকে শিল্পী, সৃষ্টিকর্তা বলতে চাও? বলতে চাও, সেই অধিকার? তোমার শিল্পবিদ্যা কি আছে তা তো জানি, কিন্তু দেখছি বটে তোমার আস্পর্ধাটাকে, তোমাকে কে গ্রাহ্য করে? কে তোমার তত্ত্ব নেয়?

সব মানি, কিন্তু এত বড় শিল্পাদিত্যের আশীর্ব্বাদ পাব না এটাই বা কেমনতর?

তেরোশো বত্রিশ সালের ফাল্গুনে "বিজলী" দীনেশরঞ্জনের হাতে আসে। তার আগে সাবিত্রীপ্রসন্নের আমলেই নৃপেন "বিজলী"তে নাট্যসমালোচনা লিখত। সে সব সমালোচনা মামুলি হিজিবিজি নয়, নয় সেটা ব্যবসাদারি চোখের কটাক্ষপাত। সেটা একটা আলাদা কারুকর্ম্ম। নৃপেন তার আবেগ-গম্ভীর ভাষায় "সীতা"র প্রশস্তি রচনা করলে—সমালোচনাকে নিয়ে গেল কবিতার পর্যায়ে।

সে সব আলোচনা বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। বলা বাহুল্য, শিশিরকুমারের চোখ পড়ল, কিন্তু তাঁর চোখ পড়ল লেখার উপর তত নয়, যত লেখকের উপর। নৃপেনকে তিনি বুকে করে ধরে নিয়ে এলেন।

কিন্তু শুধু শ্রদ্ধাভক্তির কবিতাকে কি তিনি মূল্য দেবেন? চালু কাগজের প্রশংসা প্রচারে কিছু না-হয় টিকিট বিক্রির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কবিতা? কেই বা পড়ে, কেই বা অর্থ-অনর্থ নিয়ে মাথা ঘামায়? পত্রিকার পৃষ্ঠায় ফাঁক বোজাবার জন্যেই তো কবিতার সৃষ্টি। অর্থাৎ পদের দিকে থাকে বলেই তার আরেক নাম পদ্য।

জানি সবই, তবু সেদিন শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে যে লোক কালাতীত বেদনার ব্যঞ্জনা আনলেন তাকেই বা প্রকাশ না করে থাকতে পারি কই? সোজাসুজি শিশিরকুমারের উপর এক কবিতা লিখে বসলাম। আর একটু সাফ-সুতরো জায়গা করে ছাপালাম "বিজলী"তে।

দীর্ঘ দুই বাহু মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিল: সীতা, সীতা, সীতা—
পলাতকা গোধূলি প্রিয়ারে,
বিরহের অস্তাচলে তীর্থযাত্রী চলে গেল ধরিত্রী-দুহিতা
অন্তহীন মৌন অন্ধকারে।
যে কান্না কেঁদেছে যক্ষ কলকণ্ঠা শিপ্রা-রেবা-বেত্রবতী তীরে
তারে তুমি দিয়েছ যে ভাষা;
নিখিলের সঙ্গীহীন যত দুঃখী খুঁজে ফেরে বৃথা প্রেয়সীরে
তব কণ্ঠে তাদের পিপাসা।
এ বিশ্বের মর্ম্মব্যথা উচ্ছ্বসিছে ওই তব উদার ক্রন্দনে,
ঘুচে গেছে কালের বন্ধন;
তারে ডাকো—ডাকো তারে—যে প্রেয়সী যুগে-যুগে চঞ্চল চরণে
ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন।
বেদনার বেদমন্ত্রে বিরহের স্বর্গলোক করিলে সৃজন
আদি নাই, নাহি তার সীমা;
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব প্রত্যূষ স্বপন
চিত্তে তব ধ্যানের মহিমা॥

শিশিরকুমারের সানন্দ ডাক এসে পৌছুল—সস্নেহ আহ্বান। ভাগ্যের দক্ষিণমুখ দেখতে পেলাম মনে হল। দীনেশরঞ্জনের সঙ্গে চলে গেলাম তাঁর সাজঘরে। প্রণাম করলাম।

নিজেই আবৃত্তি করলেন কবিতাটা। যে অর্থ হয়তো নিজের মনেও অলক্ষিত ছিল তাই যেন আরোপিত হল সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরের ঔদার্য্যে, বললেন, 'আমাকে ওটা একটু লিখে-টিখে দাও, আমি বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখে দিই এখানে।'

দীনেশরঞ্জন তাঁর চিত্রীর তুলি দিয়ে কবিতাটা লিখে নিলেন, ধারে-ধারে কিছু ছবিরও আভাস দিয়ে দিলেন হয়তো। সোনার* জলে কাজ করা ফ্রেমে বাঁধিয়ে উপহার দিলাম শিশিরকুমারকে। তিনি তাঁর ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলেন।

একটি স্বজনবৎসল উদার শিল্পমনের পরিচয় পেয়ে মন যেন প্রসার লাভ করল।

... ...

তারপর থেকে কখনো-সখনো গিয়েছি শিশিরকুমারের কাছে। অভিনয়ের কথা কি বলব, সহজ আলাপে বা সাধারণ বিষয়েও এমন বাচন কাণে আর কোথাও শুনিনি। যত বড় তিনি অভিনয়ে তত বড় তিনি বলনে-কথনে। তা খৃষ্টধর্মের ইতিহাসই হোক বা সেক্সপিয়রের নাটকই হোক বা রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যই হোক। কিংবা হোক তা কোন অন্তরঙ্গ বিষয়, প্রথমা স্ত্রীর ভালবাসা। তাঁর সেই সব কথা মনে হত যেন বিকিরিত বহ্নিকণা, কখনো বা মৃগমদবিন্দু। অভিনয় দেখে হয়তো ক্লান্তি আসে, কিন্তু মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত জেগে কাটিয়ে দিতে পারি তাঁর কথা শুনে। তাতে কি শুধু পাণ্ডিত্যের দীপ্তি? তা হলে তো ঘুম পেত, যেমন উকিলের অতিকৃত বক্তৃতা শুনে হাকিমের ঘুম আসে। না, তা নয়। তাতে অনুভবের গভীরতা, কবিমানসের মাধুর্য আর সেই সঙ্গে বাচনকলার সুষমা। তা ছাড়া কি মেধা, কি দীপ্তি, কি দূরবিস্তৃত স্মরণশক্তি! মুহূর্ত্তেই বোঝা যায়

বিরাট এক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি—বৃহৎ এক বনস্পতির প্রচ্ছায়ে।

শিশিরকুমার যে কত বড় অভিনেতা, কত বড় অসাধ্যসাধক, আমার জানা-মত ছোটখাট একটি দৃষ্টান্ত আছে। সেটা আরো অনেক পরের কথা, যে বছর শিশিরবাবু তাঁর দলবল নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন। আমেরিকা থেকে একটি বিদুষী মহিলা এসেছেন ভারতবর্ষে, দৈবক্রমে তার সৌহার্দ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তাঁর খুব ইচ্ছা, বাংলাদেশ থেকে যে অভিনেতা আমেরিকা যাবার সাহস করেছেন তাঁর সঙ্গে তিনি আলাপ করবেন। শিশিরকুমার তখন নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রিটে তেতলার ফ্ল্যাটে থাকেন। তাঁর কাছে গিয়ে প্রস্তাব পেশ করলাম। তিনি আনন্দিত মনে নিমন্ত্রণ করলেন সেই বিদেশিনীকে। দিন-ক্ষণ ঠিক করে দিলেন।

নির্ধারিত দিনে বিদেশিনী মহিলাকে সঙ্গে করে উঠে গেলাম তেতলায়। সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলাম না, তাই তাঁকে বললাম, 'তুমি এই বারান্দায় একটু দাঁড়াও, আমি ভিতরে খোঁজ নিই।'

ভিতরের খোঁজ নিতে গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। দেখি ঘরের মেঝের উপর ফরাস পাতা—আর তার উপরে এমন সব লোকজন জমায়েত হয়েছেন যাদের অন্তত দিনে-দুপুরে দেখা যাবে বলে আশা করা যায় না। হার্মোনিয়ম, ঘুঙুর, আরো এটা ওটা জিনিস এখানে-ওখানে পড়ে আছে। বোধ হয় কোন নাটকের কোন জরুরী দৃশ্যের মহড়া চলছিল। কিন্তু তাতে আমার মাথাব্যথা কি? শিশিরবাবু কোথায়? এই কোথা নিয়ে এসেছি বিদেশিনীকে? আবার আরেকজন 'মিস মেয়ো' না হয়!

জিগগেস করলাম, 'শিশিরবাবু কোথায়?'

খবর যা পেলাম তা মোটেই আশাবর্ধক নয়। শিশিরবাবু অসুস্থ, পাশের ঘরে নিদ্রাগত।

কঙ্কাবতী ছিলেন সেখানে। তাঁকে বললাম আমার বিপদের কথা। তিনি বললেন, বসুন, আমি দেখছি ; তুলে দিচ্ছি তাঁকে।

সমস্ত ফরাসটাই তুলে দিলেন একটানে। ঘুঙুর, হার্মোনিয়ম, এটা-সেটা, সাঙ্গ আর উপাঙ্গের দল সব পিটটান দিলে। কোন জাদুকরের হাত পড়ল—চকিতে শ্রীমন্ত হয়ে উঠল ঘর-দোর। কোত্থেকে খানকয়েক চেয়ারও এসে হাজির হলো। বিদেশিনীকে এনে বসালাম।

তবু ভয়, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ যে অভিনেতা তাঁর স্পর্শ পেতে না তার ভুল হয়।

গায়ে একটা ড্রেসিং-গাউন চাপিয়ে প্রবেশ করলেন শিশিরকুমার। প্রতিভাদীপ্ত সৌম্য মুখে অনিদ্রার ক্লেশক্লান্তিও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। স্নিগ্ধ সৌজন্যে অভিবাদন করলেন সেই বিদেশিনীকে।

তারপর সুরু করলেন কথা। যেমন তার জ্যোতি তেমনি তার অজস্রতা। আমেরিকার সাহিত্যের খুঁটিনাটি—তার জীবন ও জীবনাদর্শ। আর থেকে থেকে ভাব-সহায়ক কবিতার আবৃত্তি। সর্বোপরি এক সৃজনপিপাসু শিল্পীমনের দুর্বারতা। বিদেশিনী মহিলা অভিভূত হয়ে রইলেন।

চলে আসবার সময় জিগগেস করলাম মহিলাকে: 'কেমন দেখলে' ?

'চমৎকার। মহৎ প্রতিভাবান—নিঃসন্দেহ।'

ভাবি, এত মহৎ যাঁর প্রতিভা তিনি সাহিত্যের জন্যে কি করলেন ? অনেক অভিনেতা তৈরি করেছেন বটে, কিন্তু একজন নাট্যকার তৈরি করতে পারলেন না কেন ?

... .

শিশিরকুমার ভাদুড়ির নাট্যনিকেতনে একদা রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন 'শেষরক্ষা' দেখতে। সেটা "কল্লোলের" পক্ষে একটা স্মরণীয় রাত, কেন না সে অভিনয় দেখবার জন্যে "কল্লোলের" দলেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। আমরা অনেকেই সেদিন গিয়েছিলাম। অভিনয় দেখবার ফাঁকে-ফাঁকে বারে বারে রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছি তাতে কখন্ও কতটুকু হাসির রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। স্বভাবতই, অভিনয় সেদিন ভয়ানক জমেছিল, এবং 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে' গানের সময় অনেক দর্শকও সুর মিলিয়ে ছিল মুক্তকণ্ঠে। শেষটায় আনন্দের লহর পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। শিশিরবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলেন কবির কাছে, অভিনয় কেমন লাগল তাঁর মতামত জানতে। সরলস্নিগ্ধ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কাল সকালে আমার বাড়ীতে যেও, আলোচনা হবে।' আমাদের দিকেও নেত্রপাত করলেন: 'তোমরাও যেও।'

দীনেশদা, নৃপেন, বুদ্ধদেব আর আমি—আর কেউ সঙ্গে ছিল কিনা মনে করতে পারছি না—গিয়েছিলাম পরদিন। শিশিরবাবুও গিয়েছিলেন ওদিক থেকে। রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসবার ঘরে একত্র হলাম সকালে। স্নানশেষে রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকলেন।

কি কি কথা হয়েছিল স্পষ্ট কিছু মনে নেই। ইংরিজি পাবলিক-কথাটার রসাত্মক অর্থ করেছিলেন—লোকলক্ষ্মী—এ শব্দটা গেঁথে আছে। সেদিনকার সকালবেলার সেই ছোট্ট ঘটনাটা উল্লেখ করছি, আর কিছুর জন্যে নয়, রবীন্দ্রনাথ যে কত মহিমাময় তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম বলে। এমনিতে শিশিরকুমার আমাদের কাছে বিরাট বনস্পতি—অনেক উচ্চস্থ। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথের সামনে ক্ষণকালের জন্যে হলেও, শিশিরকুমার ও আমাদের মধ্যে যেন কোনই প্রভেদ ছিল না। দেবতাত্মা নগাধিরাজের কাছে বৃক্ষ-তৃণ সবই সমান। ..'

শিশিরকুমারের দ্বারা গৃহীত ভূমিকা

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর সুদীর্ঘ নাট্যজীবনে বহু শ্রেণীর বহু ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তার সম্পূর্ণ ফর্দ্দ দাখিল করা সম্ভব হ'ল না। বাংলা নাট্যজগতে সৌখীন শিল্পীরূপে তিনি যে সব ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন, প্রথমেই সেইগুলির নাম উল্লেখ করা হ'ল। ব'লে রাখা ভালো, ভূমিকাগুলি যথাক্রমে সাজানো হয় নি।

অবৈতনিক নাট্যশালায় সর্ব্বপ্রথমে (ইংরেজীতে) "জুলিয়াস সিজারে" ব্রুটাস ; "হ্যামলেটে" রাজা ; প্রেতাত্মা ; তারপর "কুরুক্ষেত্রে" অভিমন্যু ভূমিকায় অভিনয় করবার পর আবার ইংরেজীতে "ম্যাকবেথে" ম্যাকবেথ। "বৈকুণ্ঠের খাতা"য় কেদার ; তিনকড়ি ; অবিনাশ ; "রাণা প্রতাপে" আকবর, "বুদ্ধদেবে" বুদ্ধদেব ; "চন্দ্রগুপ্তে" চাণক্য ; "জনা"য় প্রবীর ; "অশোকে" অশোক ; "ভীষ্মে" পরশুরাম, "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে" ভীম ; ব্রাহ্মণ ; দূত ; "রঘুবীরে" রঘুবীর ; সাহজাহান ; "চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে"-তে ভব ; এবং "পুনর্জ্জন্মে" অশ্বিনী ; সৌদামিনী প্রভৃতি। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বহু হাস্য ও রঙ্গ নাট্যেও তিনি আরো অনেক ছোট ছোট ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন।

অবৈতনিক নাট্যশালা পরিত্যাগ করবার পর শিশিরকুমারের দ্বারা এই ভূমিকাগুলি অভিনীত হয়েছে :

আলমগীর	...	"আলমগীর"
রাম	...	দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা"
রাম	.	যোগেশচন্দ্রের "সীতা"

ইন্দ্র ও গৌতম	...	"পাষাণী"
রঘুবীর	...	"রঘুবীর"
পুণ্ডরীক	...	"পুণ্ডরীক"
চাণক্য	....	"চন্দ্রগুপ্ত"
সাজাহান ও ঔরংজেব	....	"সাজাহান"
নাদির	....	"দিগ্বিজয়ী"
যুবক ও বৃদ্ধ ভীষ্ম	....	"ভীষ্ম"
কর্ণ	...	"নরনারায়ণ"
নিমাই	....	"বিষ্ণুপ্রিয়া"
নীলধ্বজ, প্রবীর ও বিদূষক ..		"জনা"
বিল্বমঙ্গল	....	"বিল্বমঙ্গল"
প্রতাপ ও রড্ডা	....	"প্রতাপাদিত্য"
নিমচাঁদ	....	"সধবার একাদশী"
কেতনলাল	....	"শঙ্খধ্বনি"
বক্তিয়ার ও ঘাতক	....	"রিজিয়া"
দিগম্বর	...	"রীতিমত নাটক"
কৃষ্ণ	...	"মহাপ্রস্থান"
জীবানন্দ	...	"ষোড়শী"
জয়সিংহ ও রঘুপতি	...	"বিসর্জ্জন"
রাজা বিক্রম	....	"তপতী"
চন্দ্রবাবু ও রসিক	....	"চিরকুমার সভা"
অবিনাশ ও তিনকড়ি	...	"বৈকুণ্ঠের খাতা"
যোগেশ ও রমেশ	....	"প্রফুল্ল"
মধুসূদন	...	"যোগাযোগ"

চন্দ্রবাবু	...	"শেষরক্ষা"
করুণাময় ও দুলালচাঁদ	...	"বলিদান"
রাবণ	...	"সরমা"
মন্ত্রী	...	"দেশবন্ধু"
সিরাজদ্দৌলা	...	"সিরাজদ্দৌলা"
?	....	"উড়োচিঠি"
জমিদার	...	"দশের দাবী"
নাট্যাচার্য্য	...	"জীবনরঙ্গ"
নীতিন্দ্র	...	"প্রশ্ন"
রায়বাহাদুর	....	"পরিচয়"
নিতাই	....	"খাসদখল"
রমেশ, বেণী ও গোবিন্দ	...	"রমা"
রাসবিহারী ও নরেন	....	"বিজয়া"
কেদার ও সুরেশ	....	"গৃহদাহ"
বিপ্রদাস	....	"বিপ্রদাস"
পীতাম্বর	....	"বিরাজবৌ"
জেঠামহাশয়	...	"মায়া"
ভীম ও ভীষ্ম	...	পাণ্ডবগৌরব
ঘাতক	...	"হাস্নু-নো-হানা"
যাদব	....	"বিন্দুর ছেলে"
গোবিন্দলাল	...	"ভ্রমর"
মিঃ সিং	....	"বিবাহ বিভ্রাট"
রতনচাঁদ	....	"মুক্তার মুক্তি"
রমাবল্লভ ও মৃগাঙ্ক	...	"মন্ত্রশক্তি"

চন্দনক	...	"শ্যামা"
রাজা বীরেন্দ্র সিংহ	...	"অভিমানিনী"
মাইকেল	..	"মাইকেল"
[illegible]	...	"দেশবন্ধু"
জাহান্দার শা	....	"তখৎ-এ তাউস"